কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা

মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য

এডোলেসেন্ট হেলথ প্রোগ্রাম
ম্যাটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
Directorate General of Family Planning
Kingdom of the Netherlands
unicef

উপদেষ্টা ও নির্দেশক	:	ডা. মো. শামসুল হক লাইন ডিরেক্টর, এমএনসিএন্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
সম্পাদক	:	ডা. মো. সবিজুর রহমান প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডোলসেন্ট এন্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম
সহ-সম্পাদক	:	ডা. মো. আমান উল্লাহ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার– এডোলসেন্ট হেলথ, এডোলসেন্ট এন্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম ডা. সিরাজুম মুনিরা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার– স্কুল হেলথ, এডোলসেন্ট এন্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম ডা. মো. জয়নাল হক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এঅ্যান্ডআরএইচ) এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ডা. আবু সাদাত মো. সায়েম, হেলথ স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ ডা. মো. মুনির হোসেন, প্রোগ্রাম এনালিস্ট, ইউএনএফপিএ
সংকলন	:	ডা. শাহানা নাজনীন, কনসাল্টেন্ট, এডোলেসেন্ট হেলথ, ইউনিসেফ
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	:	ফারহানা শামছ্ সুমি, হেলথ অফিসার, ইউনিসেফ ডাঃ নাসরিন আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার– মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন, এডোলসেন্ট এন্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম
প্রকাশক	:	এডোলসেন্ট এন্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম, এমএনসিএন্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহযোগিতায় ইউনিসেফ ও নেদারল্যান্ড দূতাবাস
প্রস্তুতকাল	:	২০১৯-২০২০

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা

মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য

এডোলেসেন্ট হেলথ প্রোগ্রাম
ম্যাটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
Directorate General of Family Planning
Kingdom of the Netherlands
unicef

মুখবন্ধ

কৈশোরকাল মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যখন তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো ঘটে। এই পরিবর্তনগুলো খুব স্বাভাবিক হলেও কিশোর-কিশোরীদের অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে তারা অনেকসময় বিপদের সম্মুখীন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২৩ ভাগ কিশোর-কিশোরী। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে সুস্থ রাখতে এবং দক্ষ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে একদিকে যেমন তাদেরকে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য দিতে হবে, অন্যদিকে তেমনি চিকিৎসাসেবাও দিতে হবে; উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মানুষ যেকোনো স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রথমে মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী অথবা সেবাপ্রদানকারীদের কাছেই সাহায্যের জন্য যান তারা সাধ্যমতো উপদেশ ও সমাধান দেন এবং প্রয়োজনে উচ্চ পর্যায়ে রেফার করেন। এরা সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন সমাজের অন্যান্য গেটকিপারদের সচেতন করতে এবং অনুকুল পরিবেশ তৈরি করতে।

মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ (কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক প্রোভাইডার বা সিএইচসিপি, পরিবার কল্যাণ সহকারী বা এফডাব্লিউএ, হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা এইচএ) কমিউনিটিতে সকল ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকেন। সেজন্য তারা বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বা ওরিয়েন্টেশন গ্রহণ করে ও পরবর্তীতে প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পন্ন করে। তারা যাতে গুণগত মান বজায় রেখে কিশোর-কিশোরীদের কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যসেবা, কাউন্সেলিং সেবা ও রেফারাল সেবা প্রদান করতে পারেন, সে লক্ষ্যে এই 'কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা' তৈরি করা হয়েছে। সহায়িকাটি প্রণয়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কৈশোর স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। সকলের এই সম্মিলিত প্রয়াস সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে সহায়ক হবে এবং বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়নে যারা অবদান রেখেছেন

	নাম	পদবী
১	ডা. মো. শামসুল হক	লাইন ডিরেক্টর, এমএনসিএন্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২	ডা. মো. সবিজুর রহমান	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডোলসেন্ট এন্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম
৩	ডা. মো. আমানুল্লাহ	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এএইচ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৪	ডা. মো. জয়নাল হক	প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এঅ্যান্ডআরএইচ), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৫	জাকিয়া আক্তার	ডেপুটি ডিরেক্টর (পিএম), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬	ডা. মনজুর হোসেন	অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, এমসিএইচ সার্ভিসেস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতর
৭	ডা. আবুল মাসুদ মো. নূরুল করিম	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এইচএসএম), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৮	ডা. নাসরিন আক্তার	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এমএনঅ্যান্ডই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৯	ডা. আয়েশা আফরোজ চৌধুরী	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জিএনপিএসইউ এইচইইউ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১০	মো. সাইদুর রহমান খান	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জিএনপিএসইউ, এইচইইউ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১১	মো. বজলুর রহমান	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এলএইচইপি, বিএএইচই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১২	প্রফেসর ডা. আফরোজা বেগম	প্রধান, এমসিএইচ বিভাগ, নিপসম
১৩	ডা. ফারিহা হাসিন	সহযোগী অধ্যাপক, ডিপিএইচআই, বিএসএমএমইউ
১৪	ডা. সাদিয়া আহমেদ	মেডিকেল অফিসার-এমসিএইচএফপি, এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
১৫	প্রফেসর সারিয়া তাসনিম	প্রফেসর, গাইনী ও অবস, ডিসিএমসি, ওজিএসবি
১৬	ডা. মো. মোখলেসুর রহমান	পিএম, এনএনএইচপি ও আইএমসিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৭	ডা. আবুল খায়ের মো. রফিকুল হায়দার	এডি-পিএসসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৮	ডা. মো. জহুরুল ইসলাম	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনবিএইচ এনএনএইচপি ও আইএমসিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৯	ডা. শিমুলকলি হোসেন	প্রাক্তন প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডিজিএফপি
২০	ইসমত জাহান	ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট ও প্রধান, এনটিসিসি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২১	ডা. মাহফুজা খানম	মেরি স্টোপস ইন্টারন্যাশনাল
২২	ডা. ইখতিয়ার উদ্দিন খন্দকার	স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রধান, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল
২৩	ডা. আবু সায়েম মো. শাহীন	স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল
২৪	ফারহানা আক্তার	রেসকেএম বিশেষজ্ঞ, টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস
২৫	একেএম মাহবুবুল ইসলাম	ম্যানেজার-প্রোগ্রাম, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
২৬	নিগার সুলতানা নিপা	এমটি (যুব-বান্ধব সেবা), ডিএসকে
২৭	নাসরিন বেগম	এমটি (সিএসই), বিএনপিএস
২৮	শারমিন এফ ওবায়েদ	ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, ইউবিআর-বাংলাদেশ এলায়েন্স
২৯	ডা. এসএম মুনাভির ইউসুফ	এসএনএমপি, সেভ দি চিলড্রেন
৩০	ডা. মাহবুবুল আলম	এইচওপি, পিএসটিসি
৩১	শাকিলা মতিন	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পিএসটিসি
৩২	ডা. মো. মুনির হোসেন	প্রোগ্রাম এনালিস্ট, ইউএনএফপিএ
৩৩	শামীমা আক্তার চৌধুরী	প্রজেক্ট ম্যানেজার, বাপসা
৩৪	ডা. শাহানা নাজনীন	কনসালট্যান্ট, কৈশোর স্বাস্থ্য, ইউনিসেফ
৩৫	ডা. আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম	হেলথ স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ
৩৬	ডা. ফারহানা শামছ্ সুমি	হেলথ অফিসার, ইউনিসেফ

সূচিপত্র

অধিবেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা
	কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা	৮
অধিবেশন-১	পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও পালনীয় নিয়মাবলি	৯
অধিবেশন-২	কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ	১৩
অধিবেশন-৩	কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকার	১৯
অধিবেশন-৪	কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন	২৫
অধিবেশন-৫	কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন : মাসিকের ব্যবস্থাপনা	৩১
অধিবেশন-৬	কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তন : স্বপ্নে বীর্যপাতের ব্যবস্থাপনা	৩৫
অধিবেশন-৭	কৈশোরকালীন মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা	৪১
অধিবেশন-৮	কৈশোরকালীন সমস্যাসমূহ	৪৭
অধিবেশন-৯	কৈশোরকালীন পুষ্টি এবং পুষ্টিজনিত সমস্যা	৫৩
অধিবেশন-১০	বাল্যবিবাহ– পরিণতি ও প্রতিরোধ	৬৫
অধিবেশন-১১	পরিবার পরিকল্পনা	৭১
অধিবেশন-১২	কিশোরীদের নিরাপদ মাতৃত্ব	৭৯
অধিবেশন-১৩	কিশোরীদের অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধ ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা	৮৫
অধিবেশন-১৪	কৈশোরকালীন জেন্ডার বৈষম্য, সহিংসতা/নির্যাতন ও যৌন হয়রানি - প্রতিরোধ এবং প্রতিকার	৯১
অধিবেশন-১৫	কৈশোরে মানসিক স্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ	১০১
অধিবেশন-১৬	মাদকাসক্তি– পরিণতি ও প্রতিরোধ	১০৭
অধিবেশন-১৭	কৈশোরে যৌনবাহিত ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস	১১৩
অধিবেশন-১৮	কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং ও রেফারাল	১২১
অধিবেশন-১৯	তথ্য সংরক্ষণ, সুপারভিশন ও মনিটরিং এবং রিপোর্টিং	১২৯
অধিবেশন-২০	কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিতকরণ	১৩৩
অধিবেশন-২১	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য অর্জন	১৩৯
পরিশিষ্ট ১	প্রশিক্ষণসূচি	১৪১
পরিশিষ্ট ২	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১৪২

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা

এই কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি তৈরি করা হয়েছে মাঠ পর্যায়ে সেবাপ্রদানকারী (কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক প্রোভাইডার বা সিএইচসিপি, পরিবার কল্যাণ সহকারী বা এফডাব্লিউএ, হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা এইচএ) এবং সুপারভাইজারদের (অ্যাসিস্ট্যান্ট হেলথ ইন্সপেক্টর বা এএইচআই, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইন্সপেক্টর বা এফপিআই) প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন প্রদানের উদ্দেশ্যে। এই সহায়িকাটি তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে ও কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার গুণগতমান নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ সহায়িকায় উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাদের অর্জিত জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য/ শিক্ষা ও কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সহায়তা করবে (কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য/ শিক্ষা প্রদান, কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার একটি অংশ)। সহায়িকাটি থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন পরিবর্তন ও সমস্যাসমূহ এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা পাবেন। তাতে সেবাপ্রদানকারী যেমন কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা ও চাহিদা নিরুপণ করে তাদের সাহায্য করতে পারবেন, তেমনি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য কমিউনিটিকে ধারণা দেয়ার পর সম্পৃক্ত করতে পারবেন। কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেবাপ্রদানকারী, কিশোর-কিশোরী ও কমিউনিটি, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একসাথে কাজ করলে সেবার গুণগতমান ও কিশোর-কিশোরীদের সেবা নেয়ার হার বৃদ্ধি পাবে এবং কৈশোরবান্ধব পরিবেশ তৈরি হবে।

প্রশিক্ষণে পাঠ পরিচালনার সময় প্রশিক্ষক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (যেমন– দলীয় আলোচনা, মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, ছবি আঁকা, রোল প্লে, কেস স্টাডি ইত্যাদি) ব্যবহার করবেন। প্রয়োজনে (সময় ও অংশগ্রহণকারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সহায়িকায় উল্লেখিত পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন। এটি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রশিক্ষণ বলে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা ও বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আলোচনা বোঝার সুবিধার্থে কাজে লাগানো হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর। কারণ, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে, সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতি ও সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করেন এবং আলোচনার ফলাফল সকলের সামনে উপস্থাপন করেন যার ফলে অংশগ্রহণকারীগণ একে অন্যের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পান। এতে করে আনন্দময় প্রশিক্ষণ পরিবেশ এবং অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকের মধ্যে সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। এজন্য প্রাপ্তবয়স্করা সাধারণত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রশিক্ষণে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পরিশিষ্ট ২-এ কিছু প্রশিক্ষণ পদ্ধতি দেয়া হয়েছে যাতে প্রশিক্ষকগণ সেগুলোর সাহায্য নিয়ে প্রশিক্ষণটি সুচারুভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

অধিবেশন

১

পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও পালনীয় নিয়মাবলি

অধিবেশন ১

পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও পালনীয় নিয়মাবলি

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. সকলের সাথে পরিচিত হবেন।

২. এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ জানতে পারবেন।

৩. প্রশিক্ষণে পালনীয় নিয়মাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	পরিচিতি	৩০ মিনিট	নিজেই নিজের পরিচয় দেয়া বা একে অন্যকে পরিচয় করিয়ে দেয়া	–
২	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	প্রদর্শন	–
৩	প্রশিক্ষণে পালনীয় নিয়মাবলি	৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার, মার্কার, টেপ

সহায়ক তথ্য ১

ওরিয়েন্টেশনের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি পর্ব করার জন্য প্রশিক্ষক/সহায়ক বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। পরিচিতির সময়সীমা বিবেচনা করে নিচের পদ্ধতিসমূহ থেকে একটি বেছে নিতে পারেন–

১) প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সংক্ষেপে নিজের পরিচয় (নাম, পদবি, কর্মস্থল, দায়িত্ব ইত্যাদি) দিতে পারেন।

২) অংশগ্রহণকারীগণ জোড়ায় জোড়ায় (অংশগ্রহণকারী বা প্রশিক্ষকের পছন্দমত) আলোচনা করে একজন আরেকজনের পরিচয় দিতে পারেন।

৩) অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে নিজের পরিচয় ফ্লিপ চার্টে বড় করে লিখে, নিজের পিঠে ঝুলিয়ে প্রশিক্ষণ রুমে হাঁটবেন ও অন্যদের দেখাবেন এবং অন্যদেরগুলো দেখবেন। কারো সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাইলে এসময় তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

৪) প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তার বামদিকে যিনি আছেন, তার পরিচয় নেবেন ও অন্যরা সেগুলো শুনবেন।

৫) তিন বা চারজনের দল তৈরি করে নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় করে ফেলা যায়; তবে এতে বাকিদের সাথে পরিচয়ের সুযোগ কমে যায়।

সময় থাকলে প্রশিক্ষক সহায়ক প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশনের সাথে সম্পর্কিত কোনো খেলা বা এক্সারসাইজ দিতে পারেন। যেমন− কৈশোর বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ নিয়ে আলোচনাকে সহজ করতে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের কৈশোরকালীন সুখকর বা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতাসমূহ বর্ণনা করতে পারেন। এতে কৈশোরকালীন বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনা করতে সমস্যা কমে যাবে। তাছাড়াও অংশগ্রহণকারীগণ কৈশোরকালীন সময়ে তাদের কি কি স্বপ্ন ছিল, সেগুলোর ছবি এঁকে সকলকে দেখাতে পারেন যাতে প্রশিক্ষক/সহায়ক কৈশোরকালীন বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরতে পারেন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী (কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক প্রোভাইডার বা সিএইচসিপি, পরিবার কল্যাণ সহকারী বা এফডাব্লিউএ, হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা এইচএ) এবং তাদের সুপারভাইজারগণ (অ্যাসিস্ট্যান্ট হেলথ ইন্সপেক্টর বা এএইচআই, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইন্সপেক্টর বা এফপিআই)-কে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ বা ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা।

প্রশিক্ষণে পালনীয় নিয়মাবলি

প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হলেও প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু নিয়ম-কানুন তৈরি করতে হবে, যেমন−

- লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষাগত বা সংস্কৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও প্রত্যেককে সম্মান করতে হবে
- বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয়, যেমন− যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, মাদক ইত্যাদি আলোচনার সময় যেন প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় থাকে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে
- প্রশিক্ষণ যাতে সময়মত শুরু ও শেষ হয়, সেটা মেনে চলতে হবে
- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শুনতে ও দেখতে পাচ্ছে তা নিশ্চিত করতে হবে
- আলোচনার সময় প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে
- পুনরালোচনার জন্য অংশগ্রহণকারীদের যুক্ত করতে হবে। প্রতিটি অধিবেশন/ পাঠ পুনরালোচনা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি (যেমন− লটারি, আগে ঠিক করে রাখা, প্রত্যেককে একটি করে নতুন শিক্ষণীয় বিষয় বলতে বলা, ছবি আঁকা, পোস্টার ব্যবহার করা, একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করা, কুইজ ইত্যাদি) ব্যবহার করা উচিত যাতে অংশগ্রহণকারীগণ কাজটি করতে উৎসাহবোধ করে।
- পরস্পরকে ফিডব্যাক দেয়া ও নেয়ার আগ্রহ থাকতে হবে।

অধিবেশন

২

কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ

অধিবেশন ২

কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

২. কৈশোর উন্নয়নের গুরুত্ব ও পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান পরিস্থিতি	৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	কৈশোর উন্নয়নের গুরুত্ব কৈশোর উন্নয়ন বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ	৩০ মিনিট	দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান পরিস্থিতি

জনসংখ্যা

- বাংলাদেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ অর্থাৎ ২৭.৭ মিলিয়ন হচ্ছে কিশোর-কিশোরী। এদের মধ্যে ৪৮ ভাগ কিশোরী এবং ৫২ ভাগ কিশোর।
- এদেশের জনসংখ্যার বয়স কাঠামোতে কমবয়সী জনসংখ্যার আধিক্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

স্বাস্থ্য (বিডিএইচএস ২০১৪, ইউনিসেফ ২০১৮)

- ২০-২৪ বছর বয়সী বিবাহিত ৫৯ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের মধ্যে।
- ১৫-১৯ বছরের ৩১ শতাংশ কিশোরীরা শিশুর জন্ম দিচ্ছে।
- গর্ভবতী কিশোরীদের মধ্যে ৮০ শতাংশ প্রসবপূর্ব সেবা নিয়েছে, ৩৬ শতাংশের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভিত্তিক প্রসব হয়েছে এবং ৩৬ শতাংশ প্রসবপরবর্তী সেবা নিয়েছে।
- বাল্যবিয়ে ও মাতৃত্বজনিত সমস্যা ছাড়াও কিশোরীরা অনিরাপদ গর্ভপাত, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, নির্যাতন, যৌনবাহিত সংক্রমণ, অপুষ্টিজনিত সমস্যা (খাটো, শুকনা, রক্তস্বল্পতা) ইত্যাদির শিকার হয়ে থাকে।
- মহিলাদের তুলনায় কমসংখ্যক কিশোরীরা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে; বর্তমানে তাদের অপূরণকৃত চাহিদা হচ্ছে ১৭ শতাংশ।
- কিশোরদের সমস্যার মধ্যে রয়েছে মাদক/ ধূমপান বা অন্যান্য ধরনের আসক্তি ও অনিরাপদ যৌনমিলন।
- সর্বোপরি, কিশোর-কিশোরীরা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ ও অসচেতন, তারা এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে যেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না তেমনি তারা প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের কাছ থেকে খুব কমই সহায়তা ও সেবা নিয়ে থাকে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য সেবাদানকারীগণও কিশোর-কিশোরীদের সাথে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য তৈরি নন।

শিক্ষা

- উন্নয়নশীল দেশের কিশোর-কিশোরীরা, উন্নত দেশের কিশোর-কিশোরীদের থেকে শিক্ষার সুযোগ কম পায়
- প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ৫৪% মেয়ে ও ৬৬%ছেলে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে ১৭%কিশোরী ও ৩০% কিশোর ঝরে পড়ে (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওয়েবসাইট)।
- বাংলাদেশে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার বড় কারণ কিশোরীদের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ ও কিশোরদের ক্ষেত্রে পরিবারের জন্য উপার্জন করা।

কর্মসংস্থান

- বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে অনেক কিশোর-কিশোরীই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ করতে পারে না; দারিদ্র্যের কারণে তারা কাজ করতে বাধ্য হয় এবং বেশির ভাগই অদক্ষ খাতে।
- সারা বিশ্বে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোর-কিশোরী ১০-১৪ বছরের মধ্যে কাজে যোগ দেয়। একদিকে তারা পর্যাপ্ত সুযোগ ও সম্মানী পায় না, অন্যদিকে তাদের অনেকেই স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর এমন পরিবেশে কাজ করে।
- এর মধ্যে অনেক কিশোর-কিশোরী যৌন নিপীড়ন, মাদকাসক্তি এবং দুর্ঘটনার মতো বিভিন্ন বিপদের শিকার হয়।

সামাজিক অবস্থা

- কৈশোরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চলাচল, বন্ধু-বান্ধব ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অনেক কিশোর-কিশোরীরা সামাজিক ও পারিবারিক দিক থেকে বাধাগ্রস্ত হয়; যে কারণে তাদের নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে নেয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।
- এসময় বয়সকালীন বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা পরিবার ও অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তির সাথে সহজ ও বন্ধুসুলভ সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না।
- পাশাপাশি মা-বাবা/ পরিবারও জানে না কিভাবে কিশোর-কিশোরীদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

- দারিদ্র্য কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, যেমন– অল্প বয়সে উপার্জন করার কারণে স্কুলে যেতে না পারা বা সার্বিক শিক্ষা না পাওয়া, প্রয়োজনীয় খাবার ও পুষ্টি না পাওয়া, ইত্যাদি কারণে তারা বঞ্চিত ও নিপীড়িত এবং মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

জেন্ডার

- কৈশোরকাল থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য শুরু হয়। সমাজে ও পরিবারে কিশোরদের তুলনায় কিশোরীরা বেশি জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হয়, যেমন– পরিবারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা ও চলাফেরার ক্ষেত্রে সুযোগ কম পাওয়া, পুষ্টির ক্ষেত্রে পরিমাণে কম পাওয়া, মতামত ছাড়া কিশোরীদের বিয়েতে বাধ্য করা, অল্প বয়সে পরিবারের জন্য উপার্জন করতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

কৈশোর উন্নয়নের গুরুত্ব

- কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করলে তারা শিক্ষিত হয় ও তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং তারা পরবর্তীতে ভালো কাজ পায়; ভবিষ্যতে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যাজনিত খরচ এড়ানো সম্ভব হয় এবং অসুস্থতা ও মৃত্যু ঝুঁকি কমায়। যদি কৈশোর অবস্থায় সঠিক বৃদ্ধি না হয় বা মারা যায়, তাহলে পূর্ববর্তী সকল বিনিয়োগ ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং, জনসংখ্যার এই বিশাল অংশটির জন্য প্রয়োজন ব্যাপক ও উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং নিজেদের উপযুক্তভাবে তৈরি করতে কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও সুযোগ পেতে পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সহায়তা দরকার।
- কৈশোর স্বাস্থ্য ও উন্নয়নকে সমর্থন করে এবং তাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুকূল ভূমিকা রাখে তেমন নীতিমালা ও আইনসমূহ তাদের প্রয়োজন।

কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ

- কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৭-২০৩০ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- জাতীয় কৌশলপত্রের উপর ভিত্তি করে কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়েছে ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে যাচ্ছে।
- বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র), সরকারি প্রচেষ্টায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা চালু হয়েছে। এজন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহও বিভিন্ন জেলায় কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শারীরিক শিক্ষা কারিকুলামে কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষকদের কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

অধিবেশন

৩

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকার

অধিবেশন ৩

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকার

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা বলতে সক্ষম হবেন।

২. মহিলা ও পুরুষের প্রজনন অঙ্গসমূহ এবং তাদের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।

৩. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারসমূহ বলতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা এবং মহিলা ও পুরুষের প্রজনন অঙ্গসমূহ	২৫ মিনিট	ছবি আঁকা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ছবি
৩	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারসমূহ	১০ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ৩

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকার

স্লাইড ৩.১:

প্রজনন স্বাস্থ্য

প্রজনন স্বাস্থ্য হলো প্রজনন অঙ্গসমূহের স্বাস্থ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রজনন স্বাস্থ্য কেবল প্রজনন অঙ্গসমূহের রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে না, বরং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে কল্যাণকর অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনকে বোঝায়।

যৌন স্বাস্থ্য

যৌন স্বাস্থ্য ব্যক্তির যৌন অবস্থানের শারীরিক, আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আত্মিক অবস্থার সঙ্গে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়, যা তাকে পারস্পরিক আনন্দ এবং সংযমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে যৌন ও প্রজনন আচরণকে সংযত করে এবং তার ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ হতে, ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে এবং আনন্দ বা তৃপ্তি পেতে সাহায্য করে (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা)।

প্রজনন অঙ্গসমূহ এবং এর কাজ

যৌনকর্ম ও গর্ভধারণ বা সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়ায় জড়িত অঙ্গকে প্রজনন অঙ্গ বলে। কিছু প্রজনন অঙ্গ থাকে শরীরের ভেতরে আর কিছু অঙ্গ থাকে শরীরের বাইরে।

<table>
<tr><th colspan="2">স্লাইড ৩.২:</th></tr>
<tr><th>স্ত্রী/মহিলা প্রজনন অঙ্গসমূহ</th><th>পুরুষ প্রজনন অঙ্গসমূহ</th></tr>
<tr><td>মহিলার শরীরের বাইরে অঙ্গসমূহ যৌনকর্ম ও প্রক্রিয়ায় জড়িত আর ভেতরের অঙ্গসমূহ গর্ভধারণ বা সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়ায় জড়িত। সেগুলো হচ্ছে–
– জরায়ু
– ডিম্বাশয়
– ডিম্ববাহী নালি ও
– যোনিপথ</td><td>পুরুষের যে সমস্ত অঙ্গ শুক্রাণু উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং পরিবহনে অংশ নেয় তাদেরকে পুরুষ প্রজনন অঙ্গ বলে।
– পেনিস/ পুরুষাঙ্গ
– টেস্টিস/ অণ্ডকোষ ও
– স্কোটার্ম/ অণ্ডকোষের থলি</td></tr>
<tr><td>নারী প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ হচ্ছে :
▪ ডিম্বাশয়
▪ ডিম্বনালি
▪ জরায়ু
▪ জরায়ুর মুখ (সার্ভিক্স)
▪ যোনীপথ বা সন্তান হবার রাস্তা
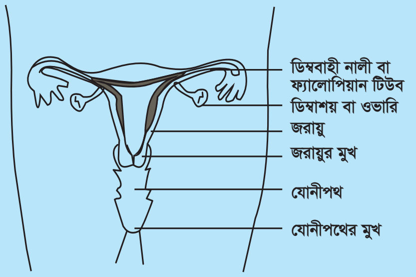
</td><td>পুরুষ প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ হচ্ছে :
▪ অন্ডকোষ
▪ পুরুষাঙ্গ বা লিঙ্গ
▪ অন্ডকোষ থলি
▪ শুক্রবাহী নালী
▪ বীর্যথলি
▪ মূত্রনালী
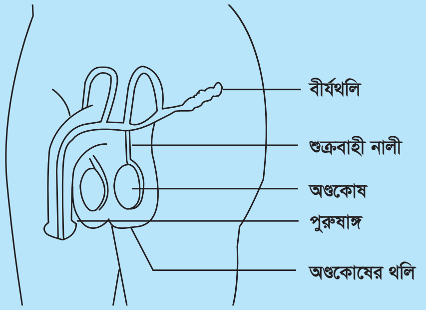
</td></tr>
</table>

ডিম্বাশয়ঃ জরায়ুর দুইপাশে ১টি করে দুটি ডিম্বাশয়/ওভারি আছে। প্রত্যেক মাসিক চক্রের ২৮ দিনের মাঝামাঝি সময়ে ডিম্বাশয় দুটির যেকোনো একটিতে একটি ডিম্ব পরিপক্ব হয় ও ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে ডিম্ববাহী নালিতে ঢোকে। এই প্রক্রিয়াকে ওভুলেশন বলে।

জরায়ুঃ জরায়ু হচ্ছে তলপেটের ভেতরে ফাঁপা ত্রিকোণাকৃতি অঙ্গ। এর সামনে থাকে মূত্রথলি ও পেছনে মলাধার। জরায়ুর দুইটি ভাগ– মূল অংশ বা বডি ও জরায়ুর মুখ। মূল অংশের ওপরের দুইকোণা থেকে দুটি ডিম্ববাহীনালি শুরু হয়েছে। এর উপরের অংশকে ফানডাস বলে। জরায়ুর প্রথম ও প্রধান কাজ গর্ভধারণ করা। গর্ভধারণ না হলে মাসিক চক্রে হরমোনের কারণে জরায়ুর ভিতরের একটি অংশ ঝরে পড়ে, একে ঋতুস্রাব বা মাসিক বলা হয়।

জরায়ু থেকে লম্বা দুটি ডিম্ববাহীনালি দুইদিকে ডিম্বাশয়/ওভারি পর্যন্ত বিস্তৃত। ডিম্ববাহীনালির শেষ অংশ হাতের আঙুলের মত বিভক্ত থাকে যাকে ফিম্ব্রিয়া বলে। সহবাসের পর শুক্রাণু যোনিপথ থেকে জরায়ু পার হয়ে ডিম্বনালিতে আসে। এসময় যদি ওভুলেশন হয়, তবে ডিম্বাণুটি ডিম্বাশয় থেকে ফিম্ব্রিয়ার মাধ্যমে ডিম্বনালিতে প্রবেশ করে। এখানেই ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন হয়। নিষিক্ত ডিম্বটি ডিম্বনালিতে কয়েকদিন থাকার পর আবার জরায়ুতে ফিরে এসে ভ্রূণ হিসেবে গ্রথিত হয়।

যোনিপথঃ যোনিপথ জরায়ুর ভিতর থেকে শুরু হয়ে শরীরের বাইরে এসে যোনিমুখে শেষ হয়েছে। যোনিপথের সামনে মূত্রথলি ও মূত্রনালি এবং পেছনে রেকটাম ও মলনালি থাকে।

স্তনঃ স্তন সরাসরি প্রজননতন্ত্রের অংশ না হলেও আনুষঙ্গিক প্রজনন অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ শিশুর জন্মের পর স্তনেই বুকের দুধ তৈরি হয়। স্তনের মাঝখানে কালো অংশটির নাম অ্যারিওলা ও এর মাঝে কালো ছোট মাংসপিণ্ডটি নিপল বা স্তনের বোঁটা। স্তনের ভিতর অনেক দুগ্ধথলি থাকে, যেগুলো থেকে দুগ্ধনালিসমূহ দুধ বহন করে নিয়ে এসে নিপলে উন্মুক্ত হয়।

পেনিস/ পুরুষাঙ্গঃ পেনিস যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে নারীর যোনিতে শুক্রাণু প্রবেশ করায় ও এছাড়া এটি মূত্র নির্গমনের কাজও করে। যৌন উত্তেজনার সময় পেনিসে রক্ত চলাচল বেড়ে যায় এবং এটি শক্ত হয়ে আকৃতিতে বড় হয়। তারপর বীর্যপাত হয় যখন পেনিস থেকে বীর্য বেরিয়ে আসে। বীর্যপাত অনেক সময় ঘুমের মধ্যেও হতে পারে; এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

টেস্টিস/ অণ্ডকোষ ও স্কোটার্ম/ অণ্ডকোষের থলিঃ পেনিসের নিচে ঝুলে থাকা থলিটিকে স্কোটার্ম বলে যার মধ্যে দুটি 'বলের' মতো টেস্টিস থাকে। এখান থেকেই মূলত শুক্রাণু এবং পুরুষ হরমোন অর্থাৎ টেস্টোসস্টেরন তৈরি হয়।

শুক্রাণুঃ বয়ঃসন্ধি থেকে শুক্রাণু উৎপাদিত হতে শুরু করে। শুক্রাণুগুলো এক ধরনের সাদা তরল পদার্থের মধ্যে থাকে যাকে বলা হয় বীর্য। পুরুষের বীর্যপাতের সময় এগুলো পেনিসের অগ্রভাগ দিয়ে বেরিয়ে আসে। মহিলার সঙ্গে শারীরিক মিলনের সময় পুরুষের বীর্যপাত হলে তা নারীর যোনিপথ ও জরায়ু দিয়ে ডিম্বনালিতে প্রবেশ করে ও ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়। এদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকটা শুক্রাণু ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌছাতে পারে। তবে একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে সন্তান উৎপাদন করতে কেবল একটি শুক্রাণুই প্রয়োজন।

ইউরেথ্রা/ মূত্রনালিঃ দেহ থেকে মূত্র এবং বীর্য, পেনিসের অগ্রভাগ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন অধিকার

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় এবং তাদের যৌনতার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত এক প্রকার হরমোনের প্রভাবে এ বয়সের ছেলেমেয়েদের মনে যৌন চেতনা আসতে শুরু করে। কিশোর-কিশোরীদের যৌন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য জ্ঞান এ বয়স থেকেই শুরু করা উচিত এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করা উচিত। সুতরাং, প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার এই জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়।

আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক কায়রো সম্মেলনে কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত শিক্ষা ও সেবা দিয়ে তাদেরকে যৌনতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং দায়িত্বশীল আচরণে সক্ষম করে তোলা, সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা, সম্মান বজায় রাখা এবং শিশু অধিকার সনদ রক্ষায় সচেষ্টা হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। মোটা দাগে তাদের অধিকারগুলো হচ্ছে:

স্লাইড ৩.৩:
প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য অধিকার

মানবাধিকারের অংশ হিসেবে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক যেকোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সমান স্বাধীনতা রয়েছে−

- যৌনতা ও প্রজননের ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্তে অটুট থাকার অধিকার
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে যথাযথ তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার জন্ম নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ গর্ভপাত, এইচআইভি ও অন্যান্য যৌনবাহিত রোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ ও সার্বিক সেবা পাওয়ার অধিকার কিশোরী মায়ের শিক্ষা গ্রহণ ও শেষ করার অধিকার
- প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যগুলো সেবাগ্রহীতা ও প্রদানকারীর মধ্যে গোপন রাখার অধিকার
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ এমআর, এইচআইভি সংক্রমণ শনাক্ত করার এবং পূর্ণ ও সার্বিক সেবা পাবার অধিকার
- সর্বক্ষেত্রে সমন্বিত যৌন শিক্ষা পাবার অধিকার
- নিজ যৌনতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, অভিজ্ঞতা এবং আনন্দ পাবার অধিকার
- কিশোরী মায়ের শিক্ষা গ্রহণ ও শেষ করার অধিকার
- প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যের অধিকার সম্পর্কিত সকল তথ্য পাবার অধিকার
- প্রজনন ও যৌন বিষয়ক তথ্যাদি সেবাগ্রহীতা ও প্রদানকারীর মধ্যে গোপন রাখার অধিকার
- শিশু অধিকার
- বয়সভিত্তিক বৈষম্য না করার অধিকার

অধিবেশন

৪

কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

অধিবেশন ৪

কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকালের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।

২. কৈশোরকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকালের সংজ্ঞা	৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া
৩	কৈশোরকালীন পরিবর্তনসমূহ : শারীরিক ও মানসিক	৩০ মিনিট	দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন, বডি ম্যাপিং, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ৪

কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকাল এবং শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

কৈশোরকাল

কৈশোরকাল জীবনের এমন একটি সময় যখন মানুষ শিশু বা বয়স্ক, কোনোটাই নয়। শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী দ্রুত ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময়কালই হচ্ছে কৈশোর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞায় যাদের বয়স ১০-১৯ বছরের মধ্যে তারাই কিশোর-কিশোরী। এ সময়ে তাদের নানারকম শারীরিক পরিবর্তন ও প্রজনন অঙ্গসমূহের বৃদ্ধি ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তাদের সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা ও আত্ম-সচেতনতা তৈরি হয়। কৈশোরকাল দ্রুত উন্নয়নের সময়। এসময়ে কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন ধরনের নতুন যোগ্যতা অর্জন করে এবং নতুন নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যা তাদের আত্মউন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে ও সাথে সাথে স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।

বয়ঃসন্ধি

বয়ঃসন্ধি হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃপ্রাপ্ত/সাবালক হবার প্রক্রিয়া যখন তাদের শারীরিক পরিবর্তনগুলো প্রকাশ পায় এবং তারা প্রজননক্ষমতা অর্জন করে। বয়ঃসন্ধি শারীরিক পরিবর্তনসমূহকে নির্দেশ করে এবং কৈশোরকাল শৈশব ও যৌবনে মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তনসমূহকে তুলে ধরে।

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ

শারীরিক পরিবর্তনসমূহ

স্লাইড ৪.১

কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তন	কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন	কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পরিবর্তন
■ উচ্চতা ও ওজন বাড়ে	■ উচ্চতা ও ওজন বাড়ে	■ মনে নানা প্রশ্ন ও কৌতূহল জাগে
■ বুক ও কাঁধ চওড়া হয়	■ স্তনের আকার বড় হয়	■ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে
■ হালকা গোঁফের রেখা দেখা দেয়	■ গলার স্বর পরিবর্তন হয়	■ লাজুক ভাব দেখা দেয় ও সংকোচ বোধ করে
■ গলার স্বর ভেঙে যায় ও ভারি হয়	■ মাসিক শুরু হয়	■ নিজের প্রতি অন্যের বেশি মনোযোগ দাবি করে
■ অণ্ডকোষ ও লিঙ্গের আকার বৃদ্ধি পায়	■ উরু ও নিতম্ব ভারী হয়	■ আবেগপ্রবণ হয় এবং স্নেহ-ভালোবাসা পেতে চায়
■ লিঙ্গের চারপাশ ও বগলে লোম গজায়	■ যোনি অঞ্চলে ও বগলে লোম গজায়	■ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ এবং তাদের প্রতি নির্ভরতা বাড়ে
■ কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হয়	■ জরায়ু ও ডিম্বাশয় বড় হয়	■ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়
■ চামড়া তৈলাক্ত হয়	■ চামড়া তৈলাক্ত হয়	■ বড়দের মতো আচরণ করতে চায়
		■ ভাবুক এবং কল্পনাপ্রবণ হয়

স্লাইড ৪.২ :

মানসিক পরিবর্তনসমূহ

- মনে নানা ধরনের প্রশ্ন ও কৌতূহল জাগে
- বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে
- লাজুক ভাব দেখা দেয় ও সংকোচ বোধ করে
- নিজের প্রতি অন্যের বেশি মনোযোগ দাবি করে
- আবেগপ্রবণ হয় এবং স্নেহ-ভালোবাসা পেতে চায়
- বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ এবং তাদের প্রতি নির্ভরতা বাড়ে
- স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়
- বড়দের মতো আচরণ করতে চায়
- ভাবুক এবং কল্পনাপ্রবণ হয়

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. কিশোরীদের মাসিক চক্র কি ও কিভাবে হয় তা বলতে পারবেন।

২. মাসিকের ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।

অধিবেশন

৫

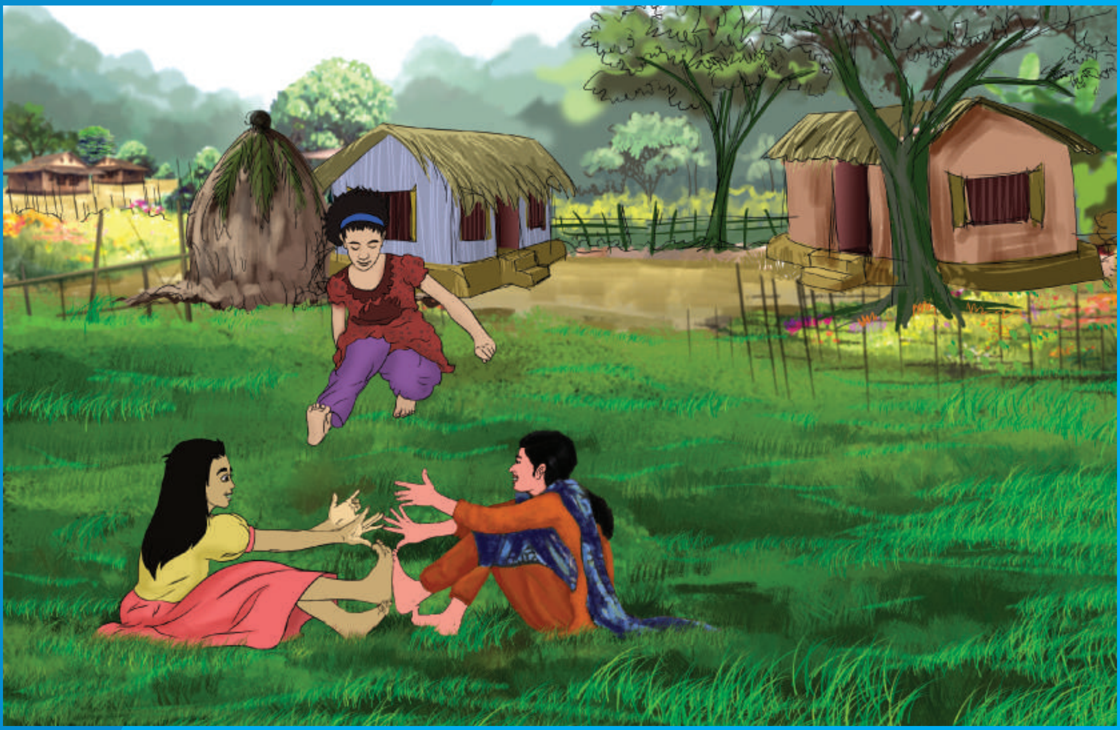

কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন : মাসিকের ব্যবস্থাপনা

সহায়ক তথ্য ৫

কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন : মাসিকের ব্যবস্থাপনা

কিশোরীদের মাসিক চক্র

ন্যাপকিন/ পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করি

ব্যবহৃত কাপড় সাবান দিয়ে ধুই

ব্যবহৃত কাপড় রোদে শুকাই

সঠিক উপায়ে কাপড় সংরক্ষণ করি

নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহৃত ন্যাপকিন ফেলি

পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাই

এসময়ে খেলাধুলা করি

স্লাইড ৫.১

মাসিক চক্র

মাসিক একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা বয়ঃসন্ধির সময় শুরু হয় ও যার মাধ্যমে একজন নারী গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত হয়।

হরমোনের প্রভাবে প্রতিমাসে জরায়ুর ভিতরের অংশ ঝরে পড়ে ও রক্তস্রাব হয়ে যোনিপথ দিয়ে বের হয়ে আসে, একে মাসিক বলে। সাধারণত প্রতিমাসে ২১ থেকে ৩৫ দিন পরপর মাসিক হয়ে থাকে এবং তা ১ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

মাসিক কিভাবে ঘটে

মহিলাদের প্রজনন অঙ্গের মধ্যে ২টি ওভারি বা ডিম্বাশয় আছে, যার কাজ ডিম্বাণু উৎপাদন করা ও হরমোন তৈরি করা। প্রত্যেক মাসিক চক্রের ২৮ দিনের মাঝামাঝি সময়ে ডিম্বাশয় দুটির যেকোনো একটিতে একটি ডিম্ব পরিপক্ব হয় ও ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে জরায়ু হয়ে ডিম্ববাহী নালিতে ঢোকে। এ সময় জরায়ু উর্বর

ডিম্বাণু গ্রহণ করার জন্য রক্তযুক্ত আস্তরণ সৃষ্টি করে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়। যদি শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলন না হয় তাহলে ভ্রূণ তৈরি হয় না ও ডিম্বাণুটি জরায়ুর ভিতরে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তখন হরমোনের প্রভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে প্রচুর পানি, শাকসবজি এবং ফলমূল খেতে হবে। মাসিক বন্ধ থাকলে, একমাসে ২/৩ বার মাসিক হলে, প্রচুর রক্তক্ষরণ বা প্রচণ্ড ব্যথা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলতে হবে ।

স্লাইড ৫.২

মাসিক ব্যবস্থাপনা

- মাসিককালীন সময়ে মেয়েদের প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। কারণ তাদের দেহ থেকে প্রতিমাসে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়। এ ঘাটতি পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন, যেমন : আমিষ (ডাল, শিম বা মটর, চীনাবাদাম, দুধ এবং দুধ জাতীয় খাদ্য, ডিম ও মাংস ইত্যাদি); আয়রন (সবুজ শাকসবজি, কচুশাক ইত্যাদি); ক্যালসিয়াম (দুধ ও দুধ জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি); ভিটামিন সি (লেবু, শিম, আমলকি, পেয়ারা ইত্যাদি)।
- প্রতিদিন ভালোভাবে গোসল ও প্রজনন অঙ্গ পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- মাসিকের সময় ঘরে তৈরি পরিস্কার ন্যাপকিন অথবা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করতে হবে। কাপড় ব্যবহার করলে ব্যবহারের পর কাপড়টি সাবান ও পানি দিয়ে ধুতে হবে এবং সূর্যের আলোতে শুকিয়ে নিয়ে পরিষ্কার প্যাকেটে পরবর্তী ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে হবে।
- রক্তস্রাব পরিমাণ অনুযায়ী স্যানিটারি ন্যাপকিন বা কাপড় দিনে অন্ততপক্ষে ৪ থেকে ৬ বার বদলাতে হবে এবং ব্যবহারের পর কাগজে মুড়িয়ে ডাস্টবিনে বা ময়লা ফেলার গর্তে ফেলতে হবে
- মাসিকের সময় হালকা ব্যায়াম ও স্বাভাবিক হাঁটাচলা করতে হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাতে হবে।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	কিশোরীদের মাসিক চক্র	২০ মিনিট	বাজগ্রুপ আলোচনা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লাশকার্ড, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	মাসিকের ব্যবস্থাপনা	১৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, আলোচনা, প্রদর্শন	
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

অধিবেশন ৬

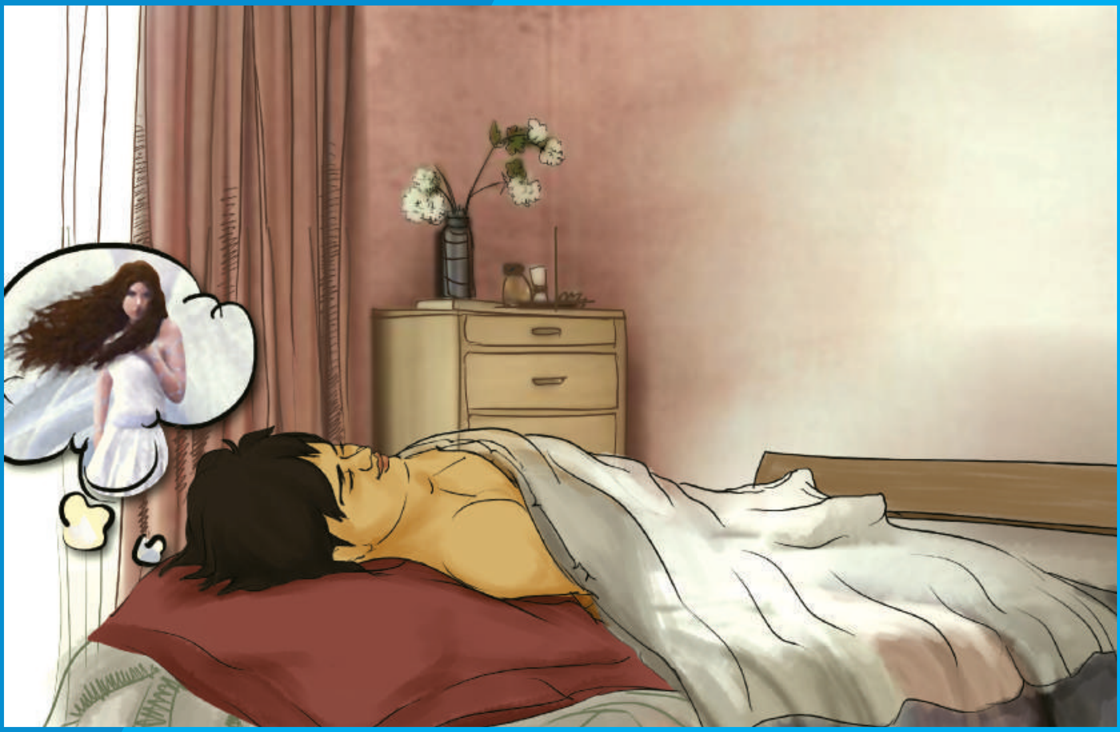

কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তন : স্বপ্নে বীর্যপাতের ব্যবস্থাপনা

সহায়ক তথ্য ৬

কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তন : স্বপ্নে বীর্যপাতের ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. কিশোরদের স্বপ্নদোষ কি ও কিভাবে হয় তা বলতে পারবেন।

২. স্বপ্নে বীর্যপাতের ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।

কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তন : স্বপ্নে বীর্যপাতের ব্যবস্থাপনা

স্বপ্নদোষ/বীর্যপাত

ছেলেদের সাধারণত বয়ঃসন্ধির সময় বা ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়স থেকে বীর্যথলিতে বীর্য তৈরি শুরু হয়। অতিরিক্ত শুক্রকীট স্বাভাবিক নিয়মে শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। একেই বলে বীর্যপাত। ঘুমের মধ্যে এই বীর্য বেরিয়ে আসাকে বলা হয় স্বপ্নদোষ। স্বপ্নদোষ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, এটি কোনো রোগ নয়। কারো স্বপ্নদোষ না হওয়াও কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় এবং এর অর্থ এই নয় যে, তার বীর্য ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে না। এজন্য 'জীবন নষ্ট হয়ে গেছে' ভেবে মন খারাপ করা কিংবা চিকিৎসার জন্য কবিরাজ/ হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত নয়।

মনে রাখতে হবে :

- বয়:সন্ধিকালে অণ্ডকোষ ধারাবাহিকভাবে শুক্র উৎপাদন করে এবং অতিরিক্ত শুক্র স্বাভাবিক নিয়মে বেরিয়ে আসে। এর সঙ্গে স্বপ্নের যোগ ঘটলেও একে স্বপ্নদোষ বলার কোনো কারণ নেই।
- স্বপ্নদোষ হলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু অন্যদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে কিশোররা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে আর এর প্রভাব পড়ে শরীরের ওপর।
- এরকম বীর্যপাতের ফলে লজ্জিত হবার বা অপরাধবোধে ভোগার কোনো কারণ নেই।
- হস্তমৈথুনও কোনো অপরাধ নয়। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরদের যৌনবোধ হয়, আর এই যৌনবোধের প্রকাশ হস্তমৈথুন। এর ফলে শরীরের বা প্রজননতন্ত্রের কোনো ক্ষতি হয় না।

বয়ঃসন্ধিকালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য করণীয়

স্লাইড ৬.১ঃ
বয়ঃসন্ধিকালে পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য করণীয়

১. এসময় বৃদ্ধির কারণে প্রচুর পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

২. ছেলেদের স্বপ্নদোষ হলে শরীর পরিষ্কার করে কাপড় পরিবর্তন করতে হবে।

৩. বিষয়টি নিয়ে মন খারাপ না করে নিজেকে বিভিন্ন ধরনের কাজে (পড়াশোনার বাইরে ভালো বই পড়া, খেলাধুলা/ ব্যায়াম করা, উন্নয়ন/সেবামূলক কাজ করা, ধর্মীয় কাজ করা ইত্যাদি) সম্পৃক্ত করতে হবে।

৪. প্রতিদিন গোসল ও গোসলের সময় যৌনাঙ্গ পরিষ্কার করতে হবে। যদি পেনিসের অগ্রভাগে বাড়তি চামড়া থাকে, সেটাও পরিষ্কার করতে হবে।

৫. বগল এবং যৌনাঙ্গের চুল নিয়মিত কাটতে হবে।

৬. সুতি আন্ডারওয়্যার পরতে হবে ও প্রতিদিন ব্যবহারের পর পরিবর্তন করতে হবে। সাবান দিয়ে আন্ডারওয়্যার পরিষ্কার করে তা রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

৭. যৌনাঙ্গ বা মলদ্বারের ভেতরে কোনো ধরনের অপরিষ্কার বস্তু প্রবেশ করানো যাবে না।

৮. অপরিষ্কার হাতে কখনই নিজের যৌনাঙ্গ ধরা যাবে না।

৯. ঘুমের মধ্যে শুক্র নিঃসরণের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পরিষ্কার কাপড় পরা।

নিজেরা করি

নিচের ঘটনাগুলো পড়ে পাশের ফাঁকা ঘরে আপনাদের পরামর্শ লিখুনঃ

রাহাতের বয়স ১৫। সে সবকিছু নিয়ে অনেক অনিয়ম করে। যেমন, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে, বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে, প্রত্যেকদিন গোসল করে না, সময়মত খায় না, একই কাপড় কয়েকদিন ধরে পরে। বাসার সবাই এ নিয়ে রাহাতকে অনেক কথা শোনায়। কিন্তু সে কারো কথা কানে নেয় না।	
গতরাতে ঘুমের মধ্যে কফিলের বীর্যপাত হয়েছে। এতে তার কাপড় আর বিছানার চাদর নষ্ট হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে না কেন তার এমন হয়েছে? কফিলের অনেক ভয় হচ্ছে। সে তার বন্ধু মনিরকে ফোন করে একথা জানালো। মনির তাকে বললো, তোর স্বপ্নদোষ হয়েছে, এটা একধরনের অসুখ। ভয় পাস না, আমার জানাশোনা একজন কবিরাজ আছে, তার কাছ থেকে ওষুধ খেলে তোর এ রোগ ভালো হয়ে যাবে।	

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	কিশোরদের স্বপ্নদোষ	১০ মিনিট	বাজগ্রুপ আলোচনা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লাশকার্ড, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	স্বপ্নে বীর্যপাতের ব্যবস্থাপনা	২৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, আলোচনা, প্রদর্শন	
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

অধিবেশন

৭

কৈশোরকালীন মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন ৭

কৈশোরকালীন মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বলতে পারবেন।

২. কৈশোরকালীন মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব	১০ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া
৩	কৈশোরকালীন মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপন	২৫ মিনিট	দলীয় আলোচনা, প্রদর্শন আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ৭

কৈশোরকালীন মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা

কৈশোরকালীন মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক সমর্থন, স্কুলের সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ ও সবার সাথে প্রাণ খুলে কথা বলার সুযোগ।

কৈশোরে যেসব শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে, সেগুলো খুবই স্বাভাবিক হলেও পরিবর্তনসমূহের কারণ, প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা কিশোর-কিশোরীদের জানা না থাকায় তারা সঠিকভাবে পরিবর্তনসমূহের সাথে মানিয়ে চলতে অনেকসময় সমস্যায় পড়ে বা ব্যর্থ হয়। কিশোর-কিশোরীদের শরীরের মতো এসময় তাদের মানসিক অবস্থাও নাজুক থাকে যা প্রতিকুল পরিবেশ বা সহায়তা না পেলে অতি সহজে যেকোনো সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কর্মক্ষমতা কমে গেলে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ ও উপসর্গ দেখে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক সমস্যা চিহ্নিত করা যায়। ফলাফল হিসাবে তাদের মধ্যে বিষণ্নতা, সহিংসতা, আত্মহত্যা, নিষেধ অমান্য/অন্যায় করার প্রবণতা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক সমস্যা দেখা দেয়।

কিশোর-কিশোরীরা যাতে তাদের মানসিক পরিবর্তনসমূহের সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে, সেজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে–

স্লাইড ৭.১

পারিবারিক সহায়তা

- কৈশোরকালীন মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বাবা-মায়ের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। কেননা সংসারের যেকোনো দাম্পত্য কলহ বা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে পরিবারের কিশোর-কিশোরীটিই সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়ে। কাজেই তার সামনে দাম্পত্য কলহ থেকে দূরে থাকতে হবে।
- বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে পারিবারিক সুসম্পর্ক তৈরি করা; তাহলে কিশোর-কিশোরীরা সমস্যায় পরিবারের সদস্যদের সাহায্য নিতে পারে।
- যেকোনো ইতিবাচক কাজের ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে হবে। কৈশোরকালীন যেকোনো সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তার সমাধান দিতে হবে।
- মা-বাবা, অভিভাবক বা পরিবার মানসিক পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের জানাতে পারেন। সেক্ষেত্রে কোনো ভুল তথ্য যাতে তাদের কাছে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- ছোটবেলা থেকে পরিবারে কিশোর-কিশোরীদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে।
- বিভিন্ন ইতিবাচক কাজের (সেবামূলক/উন্নয়নমূলক/সাংস্কৃতিক/ক্রীড়া/সামাজিক) সাথে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহ দেয়া বা তাকে সক্রিয় রাখা।
- পারিবারিকভাবে একত্রে সময় কাটানোর পরিবেশ তৈরি করা বা তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া।
- প্রয়োজনে তাকে নিয়ে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া।
- বই পড়তে উৎসাহিত করা।

স্লাইড ৭.২ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

- শিক্ষক হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা
- বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সময় কিশোর-কিশোরীদের পাশাপাশি নৈতিকতা, মূল্যবোধ বিষয়ে চর্চা করানো
- প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করা ও পরামর্শ প্রদান
- সৃজনশীল কাজে কিশোর-কিশোরীদের উৎসাহ প্রদান করা
- ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে কোনো হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা
- প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ কিশোর-কিশোরীদের বিষয়ভিত্তিক তথ্য (মানসিক পরিবর্তন, যৌনতা ইত্যাদি) জানাতে পারেন যাতে তারা সঠিকভাবে চলতে পারে

- কিশোর-কিশোরীদের জীবন দক্ষতা শিক্ষা দিতে পারে যা ব্যবহার করে তাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে
- বিভিন্ন ইতিবাচক কাজের (সেবামূলক/উন্নয়নমূলক/সাংস্কৃতিক/ক্রীড়া/সামাজিক) সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা বাড়ায় এবং নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখে।

স্লাইড ৭.৩ঃ

বন্ধু ও সহযোগীদের সহায়তা

- ভালো বন্ধু ও সহযোগী/ পিয়ার পেলে কিশোর-কিশোরীরা অনেকভাবে উপকৃত হতে পারে।
- দল ও সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত থাকলে কিশোর-কিশোরীরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে।

অধিবেশন
৮

কৈশোরকালীন সমস্যাসমূহ

অধিবেশন ৮

কৈশোরকালীন সমস্যাসমূহ

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. কৈশোরকালীন মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ বলতে পারবেন।

২. কৈশোরকালীন শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আচরণগত সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	কৈশোরকালীন মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ	১০ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া
৩	কৈশোরকালীন শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আচরণগত সমস্যাসমূহ	২৫ মিনিট	দলীয় আলোচনা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ৮

কৈশোরকালীন সমস্যাসমূহ

কৈশোরকালীন সময়ে কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আচরণগত সমস্যায় পড়ে। অনেকসময় যেগুলো তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে কিশোর-কিশোরীদের উপরোক্ত বৈশ্বিক অবস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রকট আরো কিছু সমস্যা রয়েছে যেগুলো তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আচরণগত অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে ।

স্লাইড ৮.১

কৈশোরকালীন মৃত্যুর কারণ

- ১.৩ মিলিয়ন কিশোর/কিশোরী ২০১২ সালে নিরাময়যোগ্য এমন কারণে অসুস্থ হয় বা মৃত্যুবরণ করে। কিশোর/কিশোরীদের মধ্যে মৃত্যুর প্রধান ৫টি কারণ হচ্ছে:
    - সড়ক দুর্ঘটনা
    - এইচআইভি
    - আত্মহত্যা
    - শ্বাসতন্ত্রের নিচের অংশের সংক্রমণ, এবং
    - সহিংসতা
- কিশোরী যাদের বয়স ১৫-১৯, তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রধান ২টি কারণ হচ্ছে: আত্মহত্যা ও গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতা। প্রতি বছর−
    - ২.৫ মিলিয়ন মা প্রসব করে যাদের বয়স ১৫ বছরের নিচে।
    - ১৫ মিলিয়ন মেয়ের বিয়ে হয়, যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে।
- পৃথিবীব্যাপী ৮০% কিশোর/কিশোরী অপর্যাপ্ত পরিমাণে শারীরিকভাবে সক্রিয়।
- ৭০% প্রাপ্তবয়স্ক মৃত্যুবরণ করে সংক্রামক নয় এমন রোগের কারণে, যার ঝুঁকি কৈশোর থেকে শুরু হয়।
- প্রায় প্রতি ১০ জনে ১ জন ২০ বৎসরের নিচে মেয়ে (প্রায় ১২০ মিলিয়ন) যৌন নিপীড়নের শিকার।

স্লাইড ৮.২

কৈশোরকালীন সমস্যাসমূহ

- অপুষ্টি ও অতিপুষ্টি/ স্থূলতা
- আঘাত/ দুর্ঘটনা
- নির্যাতন, হয়রানি পাচার, অপহরণ
- মাদক (সিগারেট, মদ ও অন্যান্য)
- যৌনবাহিত ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ ও শিশুর জন্মদান
- অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন
- ডায়রিয়াজনিত রোগ
- নিম্নশ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ
- মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও অপব্যবহার (সিগারেট, অ্যালকোহল ও অন্যান্য)
- মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা
- স্থানগত বা জাতিগত (endemic) কিংবা দীর্ঘস্থায়ী রোগ

কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জীবনের সমস্যা ও চাপ সম্পর্কে তাদের ধারণা না থাকার কারণে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হয়; কৈশোরকালেই তারা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করতে শুরু করে। এই সময়ে যেসব মানসিক সমস্যা শুরু হয়, যেমন– বিষণ্নতা এবং সিজোফ্রেনিয়া রোগ; সেগুলো প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত করা এবং চিকিৎসা দেয়া, এই রোগসমূহ থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবার জন্য খুবই জরুরি। কিশোর-কিশোরীরা যেভাবে জীবনের কোনো চাপ/বিপদ/সমস্যা/আঘাতকে মোকাবেলা করে, তার মধ্যে লিঙ্গভেদে পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে, ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় আগ বাড়িয়ে ও উগ্রতার সাথে বিপদ/চাপ/আঘাতের মোকাবেলা করে থাকে। মেয়েরা এইসব ক্ষেত্রে বন্ধুদের এবং নিজের স্বাস্থ্যগত চাহিদার দিকে বেশি আগ্রহী হয়।

সামাজিক অবস্থা কিশোর-কিশোরীদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর ভীষণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নেতিবাচক সামাজিক অবস্থা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক আচরণ করতে বাধ্য করে এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এখানে বর্তমান সময়ের আলোচিত বিষয় হিসেবে 'জঙ্গিবাদ' বিশেষভাবে উল্লেখ্য যার মূল শিকার বেশিরভাগই কিশোর ও যুবক।

স্বাস্থ্য সমস্যা ও বিপজ্জনক আচরণ যেগুলো উন্নয়নশীল দেশের কিশোর-কিশোরীদেরকে আক্রমণ করে, সেগুলোকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিম্নলিখিত ছকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে−

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের কিশোর-কিশোরীদের রোগ ও স্বাস্থ্যগত আচরণ				
যেসব রোগে বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা আক্রান্ত হয়	কিশোর-কিশোরীদের রোগ ও বিপজ্জনক স্বাস্থ্যগত আচরণ (সকলের জন্য সমান নয়)	কিশোর-কিশোরীদের যেসব রোগের সূত্রপাত শৈশবেই ঘটেছে	কিশোর-কিশোরীদের রোগ ও বিপদজনক স্বাস্থ্যগত আচরণ, যা ভবিষ্যৎ জীবনকে আক্রমণ করে	যেসব রোগ শিশুদের থেকে কম এবং বড়দের থেকে বেশি কিশোর-কিশোরীদের আক্রমণ করে
রোগসমূহ: যৌন বিকাশজনিত সমস্যা মনো-সামাজিক বিকাশজনিত সমস্যা আশাতীত কম বৃদ্ধি	**রোগসমূহ:** মাতৃত্বজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতা যৌনবাহিত সমস্যা (এইচআইভিসহ) যক্ষা কৃমি মানসিক রোগ	**রোগসমূহ:** রিউমেটিক হৃদরোগ পোলিও	**রোগসমূহ:** যৌন সংক্রমণ (এইচআইভসহ) কুষ্ঠ দন্ত রোগ	**রোগসমূহ:** অপুষ্টি ম্যালেরিয়া পাকস্থলিতে সংক্রমণ তীব্র শ্বাসজনিত সমস্যা
	আচরণ অ্যালকোহল ব্যবহার অন্যান্য মাদক সেবন আঘাত		**আচরণ** সিগারেট সেবন অ্যালকোহল সেবন স্বল্পাহার অনুশীলন না করা অনিরাপদ যৌনমিলন	

অধিবেশন

৯

কৈশোরকালীন পুষ্টি এবং পুষ্টিজনিত সমস্যা

অধিবেশন ৯

কৈশোরকালীন পুষ্টি এবং পুষ্টিজনিত সমস্যা

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. পুষ্টি, উপাদানসমূহ ও কৈশোরকালে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

২. কৈশোরকালীন পুষ্টিজনিত সমস্যা, এর প্রভাব ও অপুষ্টি চক্র বর্ণনা করতে পারবেন।

৩. কৈশোরকালীন পুষ্টিজনিত সমস্যার প্রতিরোধ বলতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	পুষ্টি, উপাদানসমূহ ও কৈশোরকালে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা	১০ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লাশকার্ড, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	কৈশোরকালীন পুষ্টিজনিত সমস্যা, প্রভাব, অপুষ্টি চক্র ও প্রতিকার	২০ মিনিট	দলীয় আলোচনা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ভিপকার্ড, মার্কার, টেপ
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

কিশোর-কিশোরীদের দৈনিক নমুনা খাদ্য তালিকা

কৈশোরকালে দেহের বৃদ্ধি ও গঠন হতে থাকে, সেজন্য এ সময় প্রচুর আমীষ জাতীয় এবং আয়রন, আয়োডিন ও ক্যালসিয়ামসহ অন্যান্য অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

সময়	তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য (শর্করা জাতীয় খাবার- ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, আলু, মিষ্টিআলু)	শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিকারক খাদ্য (আমিষ জাতীয় খাবার- ডিম, মাছ, মাংস, দুধ, ডাল, ও বীচি জাতীয় খাবার)	রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য (ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ খাবার- রঙ্গিন শাক-সবজি, দেশী মৌসুমী ফল)	নমুনা প্লেট
সকালের খাবার	মাঝারী সাইজের ২/৩টি রুটি অথবা ২টি পরোটা অথবা ১ বাটি ভাত	১টি ডিম অথবা ১ বাটি ঘন ডাল	১ বাটি সবজি (২/৩ রকম সবজি মিশিয়ে) অথবা সবজি ভাজি (পটল ভাজি, পেঁপে ভাজি ইত্যাদি)	
মধ্য-সকালের নাস্তা	বাড়ীতে তৈরী নাস্তা জাতীয় খাবার (চিড়া/মুড়ি+গুড়), অথবা ২/৩টি ও পাকা কলা	-	যে কোন দেশী মৌসুমী ফল (আম, কাঁঠাল, পেঁপে,কামরাঙ্গা, আনারস ইত্যাদি) ঋতুভেদে যেসব ফল সহজেই আমরা পাই।	
দুপুরের খাবার	১ বাটি ভাত	১ বাটি মাঝারী ঘন ডাল ও ১ টুকরা মাঝারী সাইজের মাছ/মাংস/কলিজা	১ বাটি শাক (লাল শাক, কচু শাক,পুঁই শাক) অথবা সবজি	
বিকালের নাস্তা	-	১ গ্লাস দুধ অথবা দুধ দিয়ে তৈরী ঘন যে কোন খাবার (ফিরনি/ সেমাই/পায়েস/পিঠা/দই ইত্যাদি)	যে কোন দেশী মৌসুমী ফল। ঋতুভেদে যেসব ফল সহজেই আমরা পাই।	
রাতের খাবার	১ বাটি ভাত	১ বাটি ঘন ডাল (যদি সম্ভব হয় ১ টুকরা মাছ/মাংস)	১ বাটি শাক অথবা সবজি	

*১ বাটি = ২৫০ মি.লি. (১ পোয়া), ১ গ্লাস = ২৫০ মি.লি. (১ পোয়া)

এছাড়াও কিশোরীদের দৈনন্দিক খাদ্য তালিকায় আয়রন সমৃদ্ধ খাবার (যেমন কলিজা, ডাটা শাক, মলা মাছ, লালশাক ইত্যাদি) থাকা অত্যন্ত জরুরি।

টিফিনে দোকানের বা ফেরিওয়ালাদের ভাজা খাবার না খেয়ে বাড়ি থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী টিফিন আনা স্বাস্থের জন্য উপকারী। সবজি/ডিম/মাংস দিয়ে তৈরি খিচুড়ি, হালুয়া, দুধের পায়েস, বাদাম, রুটি, ডিম, চিড়া/মুড়ি মোয়া, যে কোন দেশি মৌসুমী ফল (আম, কাঁঠাল, পেঁপে, আমড়া, পেয়ারা, আনারস, পাকা কলা ইত্যাদি) খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

সহায়ক তথ্য ৯

কৈশোরকালীন পুষ্টি এবং পুষ্টিজনিত সমস্যা

কৈশোরে পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সংজ্ঞা অনুযায়ী ১০-১৯ নছর নয়স সীমাকে কৈশোরকাল (adolescence) বলে। এ সময় ছেলে-মেয়ে উভয়েরই স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়। দ্রুত ওজন ও উচ্চতার বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। তার কিশোর-কিশোরীদের সঠিক বৃদ্ধির জন্য এসময় পরিমাণমতো পুষ্টিকর ও সুষম খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন। সঠিক পুষ্টি নিয়ে বেড়ে উঠলে কিশোর-কিশোরীদের মেধা ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। লেখাপড়ায় মনোযোগ, ভালো ফলাফল এবং কাজ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

স্লাইড ৯.১:

পুষ্টি ও উপাদানসমূহ

খাদ্য

মানবদেহকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য বলতে সেই সকল জৈব উপাদানকে বোঝায় যেগুলো মানবদেহ গঠনে ভূমিকা রাখে, ক্ষয়পূরণ করে, শক্তি বৃদ্ধিসহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। মানুষ খাদ্য থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।

পুষ্টি

পুষ্টি হলো একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াতে খাদ্যবস্তু খাওয়ার পরে পরিপাক হয় এবং জটিল খাদ্য উপাদানগুলো ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়। মানবদেহ এসব সরল উপাদান শোষণ করে নেয়। এসব খাদ্য উপাদান মানবদেহের শক্তি ও যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মেধা ও বুদ্ধি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে, রোগ-ব্যাধি থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে সাহায্য করে এবং সর্বোপরি কর্মক্ষম করে।

পুষ্টিকর খাদ্য

যেসব খাদ্য খেলে শরীরে তাপ ও মক্তি উৎপাদিত হয়, দেহের গঠন ও বৃদ্ধি হয়, শরীর সবল ও কর্মক্ষম থাকে তাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে। খাদ্য ও পুষ্টি একে অপরের সাথে জড়িত। প্রতিটি খাদ্য অবশ্যই পুষ্টিকর ও নিরাপদ হতে হবে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর ও মন ভালো থাকে, মনে প্রফুল্লতা আসে এবং পড়াশোনা ও কাজে মনোযোগ বাড়ে। মনে রাখতে হবে পুষ্টিকর খাদ্র গ্রহণ না করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়।

খাদ্যদ্রব্যের ভেতরের যেসব রাসায়নিক উপাদান বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শরীরের পুষ্টিসাধন করে থাকে সেগুলিকে পুষ্টি উপাদান বলা হয়। কাজের ভিন্নতা এবং রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী এদেরকে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ৬টি পুষ্টি উপাদানের প্রত্যেকটিই শরীরের সুস্থতার জন্য নিয়মিত প্রয়োজন। এই পুষ্টি উপাদানগুলো বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকে। একেকটি খাদ্যদ্রব্যের একেকটি পুষ্টি উপাদানের প্রাচুর্যতা থাকে। পুষ্টি উপাদানে প্রাচুর্যতা অনুযায়ী একেক ধরনের খাদ্যদ্রব্যকে একেকটি পুষ্টি উপাদানের উৎস খাদ্য ধরা হয়।

পুষ্টি উপাদানসমূহ, বিভিন্ন খাদ্য উৎস এবং তাদের নির্দিষ্ট কাজসমূহ

<table>
<tr><th></th><th>পুষ্টি উপাদান</th><th>খাদ্য উৎস</th><th>শরীরের প্রধান
৩ ধরনের কাজ</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>শ্বেতসার
বা শর্করা
(কার্বোহাইড্রেট)</td><td>● ভাত, রুটি, পাউরুটি, বিস্কুট, মুড়ি, চিড়া
● চিনি, গুড়, মধু
● আলু, মিষ্টি আলু</td><td rowspan="2">১। শরীরের শক্তি যোগায়, কাজ করার ক্ষমতা দেয়।</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>তেল ও চর্বি</td><td>● তেল, ঘি, মাখন
● মাছ-মাংসের চর্বি
● বাদাম, নারিকেল</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>আমিষ
(প্রোটিন)</td><td rowspan="3">প্রাণিজ: মাছ, মাংস, কলিজা, দুধ, ডিম, শুটকি মাছ
উদ্ভিদ: বাদাম, বীচি, বিভিন্ন ধরনের ডাল, তিল/তিসি
প্রাণিজ: দুধ, মাছ, মাংস, কলিজা
উদ্ভিদ: বাদাম, বীচি, শাক, সবজি ও ফলমূল
ভিটামিন ‘এ’: বিভিন্ন ধরনের রঙ্গীন শাক-সবজি, লাল শাক, গাজর, মিষ্টি কুমড়া
ভিটামিন ‘ডি’: ডিমের কুসুম, মাছের তেল, কলিজা, মাখন, পনির ইত্যাদি
ভিটামিন ‘সি’: আমলকি, করলা, কমলা, ধনেপাতা, আমড়া, তাজা ও টক জাতীয় শাক-সবজী ও ফল ইত্যাদি
ক্যালসিয়াম: দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, শুটকি মাছ, ছোট মাছ, গুড়, ছোলা ইত্যাদি
আয়রন: মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম, কচু/পুই/লাল শাক, তেতুঁল ইত্যাদি
আয়োডিন: সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিনযুক্ত লবণ</td><td>২। শরীরের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করে</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>ভিটামিন</td><td rowspan="3">৩। সব পুষ্টি উপাদানের পরিপাক ও পুষ্টি সাধনের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে শরীরকে রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে।
● রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে ও চামড়া মসৃণ করে
● হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত করে, রিকেট প্রতিরোধ করে
● ক্ষত দূর করে, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পরা বন্ধ করে, ঘা-পাঁচড়া প্রতিরোধ করে–
● রক্তস্বল্পতা, ক্ষুধামন্দা ও দুর্বলতা দূর করে
● শিশুর মানসিক বিকাশ নিশ্চিত ও গলগণ্ড রোধ করে</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>খনিজ লবণ</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>পানি</td><td>খাওয়ার পানি, বিভিন্ন তরল ও পানীয় জাতীয় খাবার এবং বিভিন্ন খাবারের জলীয় অংশ</td></tr>
</table>

কৈশোরকালে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা

কৈশোরকালে দেহের বৃদ্ধিসাধন জীবনের অন্য যেকোনো সময়ের চাইতে দ্রুত হয়। ১০-১৫ বছর বয়সের মধ্যেই উচ্চতা শতকরা আশিভাগেরও বেশি হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি বুদ্ধি, আবেগ, অনুভূতি ও হরমোনজনিত পরিবর্তনও ঘটে। কৈশোরে দ্রুত বৃদ্ধির কারণে পুষ্টিচাহিদা শিশু ও বয়স্কদের তুলনায় বেশি হয়; এজন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। তাছাড়া মাসিকের কারণেও কিশোরীদের অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন হয়। কৈশোরকালে এই দৈহিক বৃদ্ধি এবং কার্যাবলির কারণেই কৈশোরকালে সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করা জরুরি।

অপুষ্টি চক্র

গর্ভধারণ থেকে শুরু করে ভ্রুণাবস্থা এমনকি নবজাতকের প্রাথমিক অবস্থা পর্যন্ত পুষ্টির গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অপুষ্টিচক্র বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। পুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগা কিশোরীদের পর্যাপ্ত দৈহিক বৃদ্ধি না হওয়ায় বেঁটে/খাটো হয় এবং তারা কম ওজনের শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে। আর এই কম ওজনের শিশুরা যদি মেয়ে হয় তাহলে তারাও বড় হলে খাটো হয় এবং বিয়ে হলে আবারও কম ওজনের শিশুর জন্ম দেয় যা আরো ভয়াবহ। এভাবেই এই চক্র চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই চক্র ভেঙে যায়। এজন্য জীবনের সকল স্তরেই, বিশেষ করে শৈশব ও কৈশোরে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে কিশোরী ও নারীদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।

ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির একটি আদর্শ মান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী বয়সের সাথে সাথে দেহের ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির একটি আদর্শ মান রয়েছে। যদি কোনো শিশু বা কিশোর-কিশোরীদের উচ্চতার (মিটার এককে) তুলনায় ওজন কম বা বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা থাকে তাহলে তাকে আমরা অপুষ্টি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

বি.এম.আই. (Body Mass Index) :

কোনো ব্যক্তির ওজন এবং উচ্চতার হারের বর্গের অনুপাতই হলো বি.এম.আই.। এটি পুষ্টিগত অবস্থা নির্ণয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। বি.এম.আই. বের করতে ব্যক্তির ওজন কিলোগ্রাম এককে উচ্চতা মিটার এককে জানা প্রয়োজন। ওজনকে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলেই বি.এম.আই. পাওয়া যাবে। নিচে সূত্রটি দেয়া হলো–

$$\text{বি.এম.আই.} = \frac{\text{ওজন (কি.গ্রা.)}}{\text{উচ্চতা (মিটার)}^2} \qquad \text{বি.এম.আই} = \frac{২৮}{১.২৫ \quad ১.২৫} = ১৭.৯২ \text{ কি.গ্রা.}$$

১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের জন্য ওজন ও উচ্চতার আদর্শমান

বয়স (বছর)	স্বল্প অপুষ্টি (বি.এম.আই.)	স্বাভাবিক পুষ্টি (বি.এম.আই.)	স্বল্প মুটিয়ে যাওয়া (বি.এম.আই.)
১০	১৪.৮	১৬.৬	১৯.০
১১	১৫.৩	১৭.২	১৯.৯
১২	১৬.০	১৮.০	২০.৮
১৩	১৬.৬	১৮.৮	২১.৮
১৪	১৭.২	১৯.৬	২২.৭
১৫	১৭.৮	২০.২	২৩.৫
১৬	১৮.২	২০.৭	২৪.১
১৭	১৮.৪	২১.০	২৪.৫
১৮	১৮.৬	২১.৩	২৪.৮
১৯	১৮.৭	২১.৪	২৫.০

১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরদের জন্য ওজন ও উচ্চতার আদর্শমান

বয়স (বছর)	স্বল্প অপুষ্টি (বি.এম.আই.)	স্বাভাবিক পুষ্টি (বি.এম.আই.)	স্বল্প মুটিয়ে যাওয়া (বি.এম.আই.)
১০	১৪.৯	১৬.৪	১৮.৫
১১	১৫.৩	১৬.৯	১৯.২
১২	১৫.৮	১৭.৫	১৯.৯
১৩	১৬.৪	১৮.২	২০.৮
১৪	১৭.০	১৯.০	২১.৮
১৫	১৭.৬	১৯.৮	২২.৭
১৬	১৮.২	২০.৫	২৩.৫
১৭	১৮.৮	২১.১	২৪.৩
১৮	১৯.২	২১.৭	২৪.৯
১৯	১৯.৬	২২.২	২৫.৪

স্লাইড ৯.৩ : অপুষ্টি চক্র

কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টিজনিত প্রধান সমস্যাসমূহ

এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ

রক্তে লোহিত কণিকার Red Blood Cell (RBC) পরিমাণ কমে গেলে তাকে এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা বলে। কিশোরীদের দেহে লৌহজনিত আয়রনের ঘাটতি খুবই সাধারণ সমস্যা। লৌহমিশ্রিত খাবার কম গ্রহণ করলে দেহে আয়রনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং রক্তস্বল্পতা তৈরি হয়। রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে শরীরে অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায়। ফলে শারীরিক যেসব সমস্যা দেখা যায় তা হলো–

- অবসাদ, কাজে-কর্মে অনীহা, দুর্বলতাবোধ করা ও ঘুমঘুমভাব অনুভব করা
- শরীরের চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যায়
- শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়

কীভাবে এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা দূর করা যায়

- গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, টমেটো ইত্যাদি নিয়মিত খেতে হবে।
- কলিজা, মাংস এবং ডিম নিয়মিত খেতে হবে।
- ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার যেমন- লেবু, কমলালেবু, রসালো ফল, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, আম ইত্যাদি খাবার নিয়মিত খেতে হবে।
- শুষ্ক খাবার যেমন– বাদাম, কিসমিস, খেজুর।
- ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
- পায়ে সবসময় জুতা/স্যান্ডেল ব্যবহার করতে হবে যাতে পেটে কৃমি না জন্মায়। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক ঔষধ খেতে হবে।

আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট

রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে প্রতি সপ্তাহে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট ও বছরে ২ বার কৃমিনাশক ট্যাবলেট সেবন বিশ্বে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। তাই কিশোরীদের প্রতি সপ্তাহে খাওয়ার পর একটি আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খেতে হবে। আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খালি পেটে খেলে কারো বমিবমিভাব দেখা দিতে পারে। ট্যাবলেটে আয়রন থাকায় পায়খানার রং কালো ও কোষ্ঠকাঠিন্য (শক্ত পায়খানা) হতে পারে। এটা চিন্তার বিষয় নয়। এই সময় শাক-সবজি ও পানি বেশি করে খেতে হবে। এর পরেও যদি কোনো কিশোরীর মধ্যে রক্তস্বল্পতা দেখা যায় তবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ সেবন স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

ফলিক এসিডজনিত ঘাটতি : ফলিক এসিডজনিত ঘাটতির কারণে গর্ভাবস্থায় রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রগুলো থেকে প্রত্যেক কিশোরীকে আয়রন-ফলিক এসিড বড়ি বিতরণ করা হচ্ছে।

আয়োডিন ঘাটতি: মানবদেহে আয়োডিন একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। আয়োডিন ঘাটতি হলে গলগন্ড, খর্বতা ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় যা প্রতিরোধে আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হয়।

ক্যালসিয়াম ঘাটতি: ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁত গঠনে সাহায্য করে, স্নায়ুকে সবল রাখে এবং শরীরে স্বাভাবিক রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে। তাই কৈশোরে ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খেতে হয়।

পুষ্টিজনিত সমস্যা ও এর প্রভাব

দীর্ঘদিন ধরে পুষ্টির ঘাটতি হলে পুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দেয়। কৈশোরে প্রয়োজন বেশি হওয়ার কারণে কিশোর-কিশোরদের পুষ্টির ঘাটতিও তাড়াতাড়ি ঘটে। বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ ও সি -পুষ্টি উপাদানসমূহের অভাব বেশি ঘটে থাকে। অনেক কিশোরী পুষ্টিজনিত সমস্যার কারণে খাটো, শুকনা ও রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত। দৈহিক বৃদ্ধি ও গঠন দেরিতে হলে পুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত কিশোরীদের মাসিক দেরিতে শুরু হয়। কম উচ্চতা ও দেরিতে শারীরিক পূর্ণতা প্রাপ্তি কিশোরী গর্ভাবস্থার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। পুষ্টিজনিত সমস্যা কাজ করার ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা ও বোধকে কমিয়ে দেয়। শিশু, কিশোর-কিশোরী এমনকি বয়স্ক মানুষের মৃত্যু, বিকলাঙ্গতা, শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিকে ব্যহত করা এবং মানসম্পন্ন জীবনধারাকে কমিয়ে দেয়ার জন্য পুষ্টিজনিত সমস্যা দায়ী। এর পরিণতি হিসেবে জাতীয় আর্থসামাজিক উন্নয়নও বাঁধাগ্রস্ত হয়।

পুষ্টির প্রয়োজন বয়সের সাথে সাথে বদলায়। পুষ্টিজনিত সমস্যার কারণে শৈশবে শিশুর বৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্ত হলে তা পূরণ করতে ও সঠিক বৃদ্ধির জন্য কৈশোরে আরও একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং, কৈশোরে সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করা জরুরি।

মাসিককালীন সময়ে পুষ্টিকর খাদ্য

মাসিক নিয়ে আমাদের সমাজে নানা কুসংস্কার রয়েছে। যেমন- মাসিক অপরিচ্ছন্ন বিষয়। কোনো কোনো সমাজে মহিলা/কিশোরীকে আলাদা বিছানা, কম খাবার ও নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মাসিককালীন পরিচ্ছন্নতা কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে মাসিক বন্ধ থাকলে, একমাসে ২/৩ বার মাসিক হলে, প্রচুর রক্তক্ষরণ বা মাসিক চলাকালীন তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। পরিবারের সদস্যদের মাসিক চলাকালীন সময়ে কিশোরীদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে হবে।

মাসিক একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা সাধারণত ১০-১৩ বছর বয়সের মধ্যে যেকোনো সময় শুরু হয়। মাসিকের সময় কিশোরীদের মধ্যে সাধারণ কিছু উপসর্গ যেমন- মাথা ব্যথা, কোমর ব্যথা, পেট ব্যথা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে যা খুবই স্বাভাবিক।

মাসিক চলাকালীন কিশোরীর খাদ্য

মাসিকের সময় দেহ থেকে রক্তক্ষরণ হয় ফলে পুষ্টিহীনতা ও রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আঁশযুক্ত ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া দরকার। এসব ভাবার মাসিক চলাকালীন সময় সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে।

আয়রন খাবার মাসিকের সময় আয়রনের ঘাটতি দূর করে।	মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম, ঘন সবুজ পাতাজাতীয় শাকসবজি, দানাজাতীয় শস্য, মটরশুঁটি, সিম, বরবটি, বাদাম, সয়াবিন, গুড় ও শুকনো ফলে যথেষ্ট পরিমানে আয়রন থাকে।
ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার রক্তজমাট বাঁধায় সাহায্য করে।	দুধ ক্যালসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস। দুগ্ধজাতীয় খাদ্য যেমন– দই, ছানা, পনির, মাওয়া, কাঁটাসহ ছোটো মাছে প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। সবুজ শাকসবজি, লবণ, কলমিশাক, ডাঁটাশাক, পুঁইশাক, সজনে পাতা, লালশাক ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমানে ক্যালসিয়াম থাকে। সবজির মধ্যে ঢ্যাঁড়স, ধুন্দুল, বাধাকপি, সিম ইত্যাদি সবজি, ছোলা, মাসকলাই, মুগ ও সয়াবিনে ক্যালসিয়াম থাকে।
ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার মাথা ব্যথা ও পায়ের মাংসপেশির যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে।	প্রায় সবধরনের মাছেই উচ্চমাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম আছে। গমের রুটি, সাদা ভাত, সবুজ পাতাযুক্ত শাকসজি, পালংশাক, শিম, মিমের বিচি, বরবটি, মটরশুঁটি, কলা, কুমড়া, লেটুসপাতা ম্যাগনেসিয়ামের অন্যতম প্রধান উৎস। কাজুবাদাম, চীনাবাদাম– এগুলো ম্যাগনেসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস।
আঁশযুক্ত খাবার হজম বা পরিপাকে খুবই সহায়ক	ডাঁটাশাক, মটরশুটি, সীম, বরবটি, মিষ্টিআলু, গমেররুটি ঢেঁকিছাটাচাল, ওটস, বাদাম, আপেল, কালো আঙ্গুর, খেঁজুর ইত্যাদি।
ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার অনিয়মিত মাসিক ও মাসিকের সময়ে মাথাব্যথা হ্রাসে সাহায্য করে।	**ভিটামিন বি-১ সমৃদ্ধ খাবার :** দুধ, ডিম, সামুদ্রিক মাছ, কডলিভার, কলিজা, মুরগি, ছোলা, পালংশাক, মটরশুঁটি, পকাকলা ইত্যাদি। **ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার :** ভেটকি বা কোরাল মাছ, তেলাপিয়া, মাগুর ও শুটকি মাছে ভিটামিন ডি আছে। ভিটামিন ডি'র অপর একটি চমৎকার উৎস হচ্ছে দুধ। গরু, খাসির কলিজায় ভিটামিন ডি আছে। ডিমে অতিরিক্ত পরিমাণ ভিটামিন ডি আছে। যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের ডিমের কুসুম খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। শস্যদানায় ও মাশরুমে ভিটামিন ডি আছে। রোদ ভিটামিন ডি এর অন্যতম উৎস। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সমরে রোদ সবচেয়ে ভালো। পাঁচ মিনিট থেকে আধাঘণ্টা পর্যন্ত সপ্তাহে দু'বার রোদে বসলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

অধিবেশন

১০

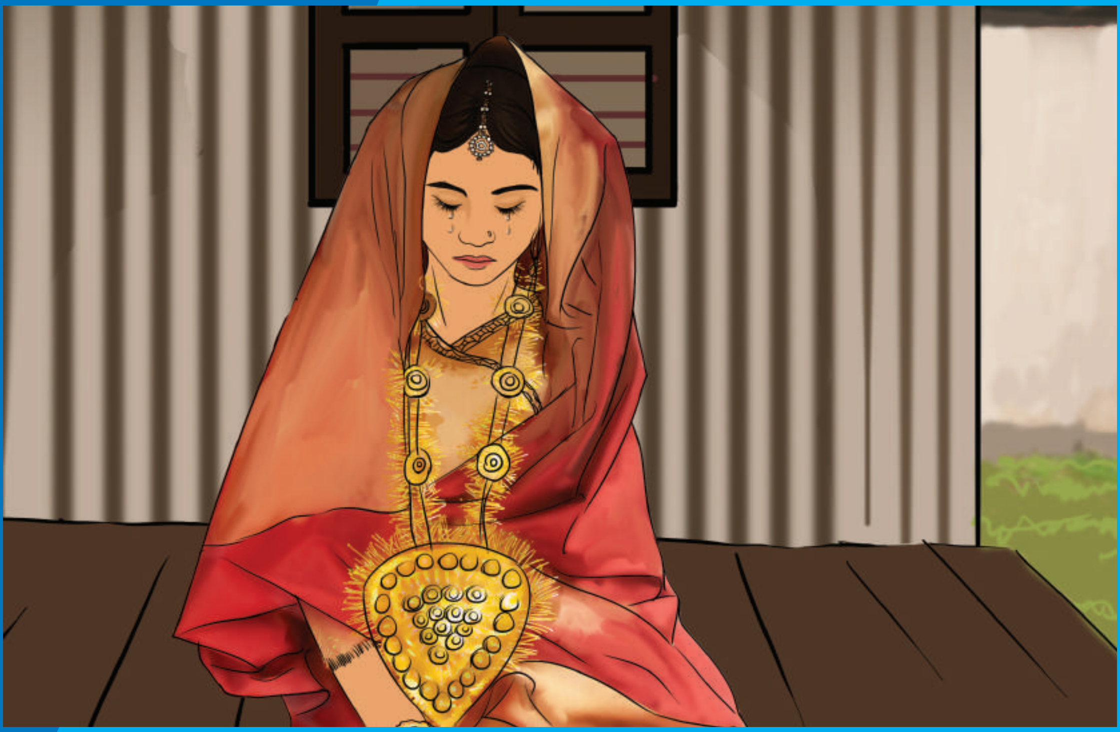

বাল্যবিবাহ– পরিণতি ও প্রতিরোধ

অধিবেশন ১০

বাল্যবিবাহ– পরিণতি ও প্রতিরোধ

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. বাল্যবিবাহের সংজ্ঞা, পরিস্থিতি ও কারণসমূহ বলতে পারবেন।

২. বাল্যবিবাহের কুফল/ পরিণতি এবং প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	বাল্যবিবাহের সংজ্ঞা, পরিস্থিতি ও কারণসমূহ	২০ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, রোল প্লে, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লাশকার্ড, ভিডিও, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	বাল্যবিবাহের কুফল/ পরিণতি এবং প্রতিরোধ	১৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লাশকার্ড, ভিডিও, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ১০

বাল্যবিবাহ, পরিণতি ও প্রতিরোধ

বাল্যবিবাহ

বাংলাদেশের আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স কমপক্ষে ১৮ ও ছেলেদের বিয়ের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর। এর থেকে কম বয়সে বিয়ে হলে তা বাল্যবিবাহ বলে গন্য করা হয়। বর্তমানে বিশেষ কয়েকটি কারণে ১৬ বছরে বিয়ে দেয়ার বিষয়টি বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও বিয়ের বয়স ১৮ বছরই বলতে হবে।

স্লাইড ১০.১ :

বাংলাদেশে কিশোরীদের অবস্থা

- বাংলাদেশে শতকরা ৫৯ জন কিশোরীর ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায়
- শতকরা ৩১ জন মেয়ে ১৮ বছরের মধ্যে গর্ভবতী হয় বা প্রথম সন্তান জন্ম দেয়, এর মধ্যে শতকরা প্রায় ১০ জন মেয়ে ১৫ বছরে ও শতকরা প্রায় ৫৮ জন মেয়ে ১৯ বছরে প্রথম সন্তানের মা হয়

- ১৫-১৯ বছরের বিবাহিত মেয়েরা প্রতি হাজারে ১১৩টি জীবিত শিশুর জন্ম দেয়
- শতকরা ৫৫ জন কিশোরী অপুষ্টির শিকার হয়
- শতকরা ৫২ জন কিশোরী রক্তস্বল্পতায় ভোগে।

(বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে ২০১৪, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ, ২০১৮)

স্লাইড ১০.২ :

বাল্যবিবাহের কারণ

- দারিদ্র্য
- কন্যা দায়গ্রস্থ পিতার দায়মুক্ত হওয়া
- সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা
- শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব
- মেয়েশিশুর প্রতি অবহেলা বা তাকে বোঝা মনে করা
- স্কুল থেকে ঝরে পড়া
- বিবাহ আইন সম্পর্কে ধারণা কম থাকা
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া
- প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার, এবং
- জেন্ডার বৈষম্য

স্লাইড ১০.৩ :

বাল্যবিবাহের রোল প্লে

এতে অংশগ্রহণকারীগণ অল্পবয়সী কিশোরী, তার বাবা-মা, ঘটক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। ঘটকের পীড়াপীড়িতে ও কম যৌতুক দেয়ার প্রলোভনে কিশোরীর বাবা-মা একজন বয়স্ক ব্যক্তির সাথে কিশোরীর বিয়ে ঠিক করে। কিশোরী দেখতে সুন্দরী হলেও তার স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয়। খবরটি জেনে গ্রামের একজন শিক্ষক কিশোরীর বাবাকে বাল্য বিয়ে দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু বাবা সে কথা না শুনে কিশোরীর বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই কিশোরীটি গর্ভবতী হয়। গর্ভাবস্থায় তার রক্তক্ষরণ শুরু হলে স্বাস্থ্যকর্মীকে শ্বশুরবাড়িতে ডাকা হয়। স্বাস্থ্যকর্মী পরীক্ষা করে কিছু করার আগেই কিশোরী মারা যায়। তখন স্বাস্থ্যকর্মী এবং শিক্ষক কিশোরীর বাবা-মা ও শ্বশুর-শাশুড়িকে ‘বাল্যবিবাহের পরিণতি ও কৈশোরে গর্ভধারণের কুফল’ সম্পর্কে জানান।

প্রশ্ন ও আলোচনা:

– বাল্যবিবাহের পরিণতি কি?

– কৈশোরে গর্ভধারণের কুফল কি?

স্লাইড ১০.৪:

বাল্যবিবাহের পরিণতি ও কৈশোরে গর্ভধারণের কুফল

- অপরিণত, অপরিপক্ব, অপুষ্ট ও স্বল্প ওজনের শিশুর জন্মদান
- কিশোরী মায়ের পুষ্টিজনিত সমস্যা
- দীর্ঘস্থায়ী প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা
- প্রসব ও প্রসবপরবর্তী জটিলতায় ভোগা
- মা ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে
- অল্পবয়সী পুরুষ সংসারের দায়িত্ব নিতে পারে না, ফলে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়
- কিশোরীর মানসিক প্রস্তুতি না থাকায় সংসারের চাহিদা মেটাতে পারে না
- কিশোরীদের ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ যৌন আচরণে বাধ্য করে
- বিবাহ বিচ্ছেদ ও আত্মহত্যা

বাল্যবিবাহ ও কৈশোরকালীন গর্ভধারণ প্রতিরোধে করণীয়

বাল্যবিবাহ কিশোরীর জীবনে চরম বিপদ ডেকে আনে– কারণ, বিয়ের পরপরই কিশোরী গর্ভধারণ করে যা তার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এসময় কিশোরীর নিজেরই শারীরিক বৃদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকে যা গর্ভধারণের জন্য উপযুক্ত নয়। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে যা করা উচিত–

- বাল্যবিবাহ ও এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা;
- বাল্যবিবাহ হলেও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার ও দেরিতে সন্তান গ্রহণে কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতন করা;
- কিশোর-কিশোরীদের জন্য উপযুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- ‘বাল্যবিবাহ’ নিয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে আলোচনা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি।

অধিবেশন

১১

খাবার বড়ি

কনডম

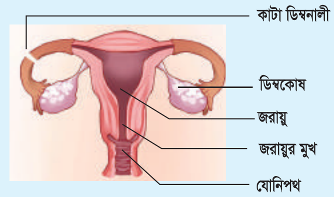

মহিলা বন্ধ্যাকরণ (টিউবেকটমি)

আইইউডি/কপার টি

ইমপ্লান্ট

ইনজেকশন

পুরুষ বন্ধ্যাকরণ (এনএসভি)

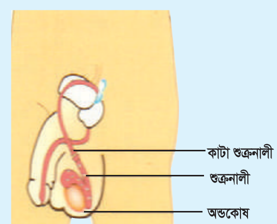

পরিবার পরিকল্পনা

অধিবেশন ১১

পরিবার পরিকল্পনা

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. পরিবার পরিকল্পনা কি এবং কেন ব্যবহার করা দরকার তা বলতে পারবেন

২. কৈশোর উপযোগী পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিসমূহ এবং উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন

৩. জরুরি গর্ভনিরোধকের ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবেন

৪. কৈশোরে পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	পরিবার পরিকল্পনা কি এবং কেন ব্যবহার করা দরকার	৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	ফ্লাশকার্ড, পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতির নমুনা, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	কৈশোর উপযোগী পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিসমূহ এবং উৎস	১৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	
৪	জরুরি গর্ভনিরোধকের ব্যবহার	৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, আলোচনা	
৫	কৈশোরে পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুরুষের ভূমিকা	১০ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	
৬	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ১১

পরিবার পরিকল্পনা

পরিবার পরিকল্পনা কি এবং এর গুরুত্ব

একটি দম্পতি তার আয়ের সাথে ও পারিপার্শ্বিক আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে কখন ও কয়টি সন্তান গ্রহণ করবে, দু'টি সন্তানের মাঝে বিরতি কতদিনের হবে বা তার পরিবার কত ছোট বা বড় হবে তা ঠিক করা এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হলো পরিবার পরিকল্পনা।

মহিলা বন্ধ্যাকরণ (টিউবেকটমি)

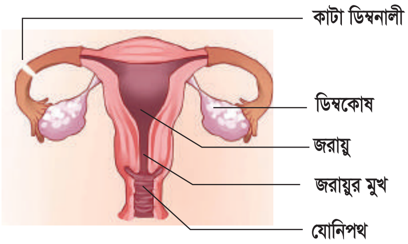

পুরুষ বন্ধ্যাকরণ (এনএসভি)

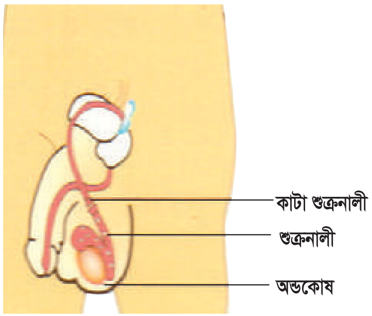

কিশোরী, শারীরিক এবং মানসিকভাবে সন্তানধারণের জন্য উপযুক্ত থাকে না। এসময়ে গর্ভধারণ মা ও সন্তান উভয়ের জন্যই অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়েও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য তারা জানে না। তাই যে কারণে পরিবার পরিকল্পনা জানা উচিত তাহলো :

১. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা
২. অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা
৩. অল্পবয়সে বিয়ে হলেও প্রথম সন্তানের জন্ম পরিকল্পনা বিলম্ব করা
৪. প্রথম সন্তান হয়ে গেলেও পরবর্তী সন্তানের মাঝে বিরতি দেয়া
৫. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ কোথায় পাওয়া যায় তা জানা
৬. জরুরী গর্ভনিরোধক সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম অনুযায়ী যেকোনো সক্ষম দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ দুইভাগে ভাগ করা যায়– আধুনিক এবং সনাতন। এখানে আধুনিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ নিরাপদ এবং যে পদ্ধতি নিবে সে ঐ পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত কিনা তা যাচাই করে গ্রহণ করা উচিত। সাধারণত সেবাদানকারী পদ্ধতি গ্রহণের সময় এ বিষয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে দুটি সামাজিক বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়: বৈবাহিক অবস্থা এবং সন্তানসংখ্যা ।

স্লাইড- ১১.১

পরিবার পরিকল্পনা আধুনিক পদ্ধতিসমূহ		
স্থায়ী	অস্থায়ী	
মহিলা স্থায়ী পদ্ধতি বা টিউবেকটমি পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি বা এনএসভি	স্বল্পমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
	১. খাবার বড়ি ২. কনডম ৩. ইনজেকশন	১. ইমপ্ল্যান্ট ২. আইইউডি

স্লাইড ১১.২

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ : ব্যবহার ও প্রয়োগ, মেয়াদকাল

পদ্ধতিসমূহ	ব্যবহার ও প্রয়োগ	মেয়াদকাল
খাবার বড়ি	প্রতিদিন খেতে হয়	প্রতিদিন জন্য
কনডম	প্রতিবার সহবাসের সময় ব্যবহার করতে হয়	ব্যবহারের সময়
ইনজেকশন	গভীর মাংসপেশিতে দিতে হয়	তিনমাস
ইমপ্ল্যান্ট	চামড়ার নিচে স্থাপন করা হয়	প্রকারভেদে ৩ বছর/৫ বছর
আইইউডি	জরায়ুতে প্রয়োগ করা হয়	১০ বছর
ভ্যাসেকটমি/এনএসভি	অণ্ডথলির চামড়াতে ছোট অপারেশনের মাধ্যমে করা হয়	স্থায়ী
টিউবেকটমি	তলপেটে ছোট অপারেশনের মাধ্যমে করা হয়	স্থায়ী

স্লাইড ১১.৩

সন্তান সংখ্যা বনাম পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ

সন্তান সংখ্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ						
	খাবার বড়ি	কনডম	ইনজেকশন	ইমপ্ল্যান্ট	আইইউডি	টিউবেকটমি	এনএসভি
নবদম্পতি বা এখনো সন্তান নেয়ার পরিকল্পনা নেই	√	√		√			
একটি জীবিত সন্তান আছে এবং পরবর্তী সন্তান	√	√	√	√	√		
দুই বা ততোধিক জীবিত সন্তান আছে	√	√	√	√	√	√	√

কনডম

কনডম রাবার বা ল্যাটেক্সের তৈরি একটি পাতলা আচ্ছাদন যা যৌনসঙ্গমের সময়ে পুরুষ এবং নারীর যৌনাঙ্গের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কনডম শুধু জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে নয়, ইহা যৌনবাহিত সংক্রমণের বিস্তার রোধ করতে পারে। কনডম বহু নামে এবং বিভিন্ন রং, আকার ও আকৃতিতে পাওয়া যায়। কনডম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। কনডম তুলনামূলকভাবে সস্তা ও সহজলভ্য। কনডমের বিশেষ কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। সহবাস শুরু করার আগে অবশ্যই কনডম পরে নিতে হবে। একবার ব্যবহার করা কনডম পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

মিশ্র খাবার বড়ি

এটা দুই ধরনের হরমোনের মিশ্রণে তৈরি বড়ি। বাজারে বিভিন্ন মাত্রা ও নামে খাবার বড়ি কিনতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম যে মিশ্র খাবার বড়ি পাওয়া যায় তার নাম সুখী। সঠিকভাবে খেলে অত্যন্ত কার্যকর, সহজে পাওয়া যায়, সহজেই এটি ব্যবহার করা ও বন্ধ করা যায়, যৌন মিলনে কোনো বাঁধা দেয় না। যেসব কিশোরীদের মাসিক অনিয়মিত, তাদের নিয়মিত মাসিক হতে সাহায্য করে।

ভুল ধারণা

- খাবার বড়ি অনুর্বর বা বন্ধ্যা করে না। কৈশোরে খাবার বড়ি খেলে এবং পরে বন্ধ করে দিলে গর্ভধারণে সক্ষম হবে, যদি অন্য কোনো সমস্যা না থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে।
- খাবার বড়ি মহিলাদের দুর্বল করে না। বরং খাবার বড়ি রক্তস্বল্পতা দূর করে। খাবার বড়ি খেলে প্রতি মাসিকের সময় কম রক্তস্রাব হয়, ফলে কিশোরীদের রক্তস্বল্পতা দূরীকরণে সহায়তা করে।

শুধু প্রজেস্টিন সমৃদ্ধ খাবার বড়ি

এটা প্রজেস্টেরন হরমোন-এর মিশ্রণে তৈরি বড়ি। যে সকল কিশোরী মা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাদের জন্য বড়িটি উপযুক্ত। সন্তান প্রসবের পরপরই এই বড়ি খাওয়া শুরু করা যায়। সন্তানের বয়স ৬ মাস পর্যন্ত এই বড়ি খাওয়া যায়, তারপর মিশ্র খাবার বড়ি শুরু করা যায়। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে এটি ‘আপন’ নামে সরবরাহ করা হয়। বাজারে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়।

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন

এতে প্রজেস্টেরন হরমোন থাকে। বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন কিশোরী মায়েরা সন্তানের বয়স ৬ সপ্তাহ হলেই ব্যবহার করতে পারেন। ডিপোপ্রভেরা ইনজেকশন ৩ মাস পরপর নিতে হয়। তবে বিশেষ অবস্থায় নির্ধারিত তারিখের ২ সপ্তাহ আগে বা ৪ সপ্তাহ সময়ের মধ্যেও নেয়া যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাসিক বন্ধ থাকে বলে রক্ত শূন্যতা হয় না।

ইমপ্ল্যান্ট

বাহুর ভিতরের অংশের চামড়ার নিচে থাকায় সহজে দেখা যায় না। দৈনন্দিন কাজে বাধা সৃষ্টি করে না। সন্তান প্রসবের পরপরই ইমপ্ল্যান্ট শুরু করা যায়। বুকের দুধের গুণগত এবং পরিমাণগত মান কোনোটারই পরিবর্তন হয় না। পরানো ও খোলার জন্য দক্ষ সেবাদানকারীর প্রয়োজন হয়। মাসিক বন্ধ থাকতে পারে বা ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব, দুই মাসিকের মধ্যে রক্তস্রাব অথবা কারো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হতে পারে।

আইইউডি

কপার-টি নামে পরিচিত, জরায়ুর ভেতরে পরানো হয়। পরানোর সাথে সাথে পদ্ধতিটি কার্যকর হয় এবং কপার-টি খুলে ফেলার সাথে সাথে গর্ভধারণ ক্ষমতা ফিরে আসে। হরমোনজনিত কোন সমস্যা নেই এবং ব্যবহারে বুকের দুধের কোনো তারতম্য হয় না। প্রথম কয়েক মাস মাসিকের সময় রক্তস্রাব বেশি হতে পারে বা অনিয়মিত হতে পারে। আইইউডি পরানোর সময় তলপেটে মোচড়ানো ব্যথা হতে পারে এবং পরবর্তী ১০-১৫ মিনিট ব্যথা থাকতে পারে। যৌনরোগ এবং এইডস প্রতিরোধ করে না।

জরুরি গর্ভনিরোধক

জরুরি গর্ভনিরোধক হলো এক ধরনের গর্ভনিরোধক যা ব্যবহার করলে অরক্ষিত বা অনিরাপদ সহবাসের পর গর্ভধারণ রোধ করা যায়। জরুরি গর্ভনিরোধক কোনো নিয়মিত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নয়, এটি শুধুমাত্র জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। জরুরি গর্ভনিরোধক গর্ভে সন্তান আসা প্রতিরোধ করে, তবে তা কখনও গর্ভপাত ঘটতে সাহায্য করে না।

কখন প্রয়োজন হয়

- কোন গর্ভনিরোধক ব্যবহার না করে বা অনিচ্ছাকৃত সহবাস হলে
- সহবাসের সময় কনডম ফেটে গেলে বা স্থানচ্যুত হলে
- পরপর ৩ দিন বা ততোদিক দিন খাবার বড়ি খেতে ভুলে গেলে
- জন্মনিয়ন্ত্রণ ইনজেকশননের পরবর্তী ডোজ নিতে নির্দিষ্ট তারিখের পর ৪ সপ্তাহের বেশি দেরি হলে
- জোরপূর্বক যৌন নির্যাতনের শিকার হলে

জরুরি গর্ভনিরোধকের ব্যবহারবিধি

- জরুরি গর্ভনিরোধক ১২০ ঘণ্টা (৫ দিন) পর্যন্ত কার্যকর থাকে এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করলে অধিক কার্যকর হয়
- যদি ১টি বড়ি থাকে তবে অরক্ষিত সহবাসের পর যত দ্রুত সম্ভব বড়ি খেয়ে নিতে হবে
- যদি ২টি বড়ি থাকে তবে ১ম ডোজ খাওয়ার ১২ ঘণ্টা পর ২য় ডোজ খেতে হবে
- জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি কার্যকর না হওয়ার কারণে গর্ভবতী হলে, গর্ভের উপর জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ির কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না

স্লাইড ১১.৪

পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রাপ্তির স্থান

- বাড়ি
- কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক
  - স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
  - উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
  - মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং সদর হাসপাতাল
  - মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
  - এনজিও এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র
  - ঔষধের দোকান

কৈশোরে পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুরুষের ভূমিকা

আদর্শগতভাবে পরিবার পরিকল্পনা হলো স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব। তাই যে পদ্ধতিই তারা বেছে নিক না কেন তাতে যেন দুজনের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটে। তথাপি গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করার প্রাথমিক দায়িত্ব দুজনের যেকোনো একজনের উপর পড়ে। সাধারণত একজন কিশোরীর যখন বিয়ে হয় তখন দেখা যায় যে তার স্বামীর বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে। নতুন বিয়ে হওয়া কিশোরী মেয়েকে যদি বাচ্চা নেয়া থেকে বিরত থাকতে হয় তবে তার সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রথমত সাহায্য করবে তার স্বামী এবং দ্বিতীয়ত অন্যান্য মহিলা অভিবাবক। একজন স্বামী যেভাবে সাহায্য করতে পারেন :

- নিজে পদ্ধতি ব্যবহার করে (কনডম)
- পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সহায়তা করা
- পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করা। যেমন– তার সাথে ক্লিনিকে যাওয়া, বিভিন্ন পদ্ধতি পছন্দ করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা এবং যে পদ্ধতি পছন্দ করেছেন সেটার সমর্থন দেয়া
- আর্থিক সহায়তা করা। যেমন– পদ্ধতি নেয়ার ব্যয় বহন করে বা কিনে দিয়ে
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপারে জটিলতা দেখা দিলে এবং ছেড়ে দেয়ার মতো অবস্থা হলে স্ত্রীকে সেবাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া বা তার ব্যবস্থা করা

অধিবেশন

১২

কিশোরীদের নিরাপদ মাতৃত্ব

অধিবেশন ১২

কিশোরীদের নিরাপদ মাতৃত্ব

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. কিশোরীদের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর ঝুঁকিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

২. গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন এবং প্রসবপরবর্তী সময়ে কিশোরীদের যত্ন ও সেবার মাধ্যমে তাদের নিরাপদ মাতৃত্ব কিভাবে নিশ্চিত করা যায় তা বলতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	কিশোরীদের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর ঝুঁকিসমূহ	১৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ভিপকার্ড, মার্কার, ফ্লাশকার্ড, সরকারি/ বেসরকারি সংস্থার আইইসি উপকরণ
৩	গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন এবং প্রসবপরবর্তী সময়ে কিশোরীদের যত্ন ও সেবার মাধ্যমে তাদের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ	২০ মিনিট	বাজগ্রুপ আলোচনা, প্রদর্শন, আলোচনা	
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ১২

কিশোরীদের নিরাপদ মাতৃত্ব

কিশোরীদের গর্ভধারণে মা ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশি। শারীরিক গঠন ও সামাজিক অবস্থার কারণে তাদের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসবপরবর্তী সময়ে এই ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

স্লাইড ১২.১

কিশোরীদের মাতৃত্বজনিত ঝুঁকি

- **গর্ভজনিত উচ্চ রক্তচাপ**
- **গর্ভকালীন রক্তস্বল্পতা**
- **প্রি-একলাম্পশিয়া**
- **বাঁধাগ্রস্ত প্রসব**
- **মৃত সন্তান প্রসব**
- **সময়ের আগে সন্তান জন্ম দেয়া**
- **কম ওজনের সন্তান জন্ম দেয়া**
- **প্রসবপরবর্তী বিষণ্ণতা**
- **অপর্যাপ্ত শিশু পরিচর্যা ও বুকের দুধ।**

গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে কিশোরী মায়েদের যত্ন ও সেবা

মা ও শিশুর সমস্যা কমাতে ও তাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে প্রাথমিক অবস্থায় গর্ভ শনাক্ত করা এবং সঠিকভাবে গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী যত্ন দেয়া প্রয়োজন।

ক. প্রাথমিক অবস্থায় কিশোরীর গর্ভ শনাক্ত করে সে যাতে পরিবারে প্রয়োজনীয় যত্ন ও সহায়তা পায়, সেটা নিশ্চিত করার জন্য পরিবারের সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

খ. গর্ভকালীন চেকআপ।

স্লাইড ১২.২

গর্ভকালীন চেকআপ

- **গর্ভকালীন চেকআপঃ** প্রশিক্ষিত সেবা প্রদানকারীর দ্বারা, কমপক্ষে ৪ বার (১-৪ মাসে ১ বার, ৬-৭ মাসে ১ বার, ৮ মাসে ১ বার এবং ৯ মাসে ১ বার)
- স্বাস্থ্যশিক্ষা (পুষ্টি, বিশ্রাম, কাজ, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে), টিডি বা টিটেনাস-ডিপথেরিয়ার টিকা (৫ ডোজ না দেয়া থাকলে) ও প্রসব পরিকল্পনার পরামর্শ

এসময়ে কিশোরীদের কোনো জটিলতা (যেমন– প্রিএকলাম্পশিয়া, একলাম্পশিয়া ও গর্ভফুল আটকে যাওয়া) দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত হাসপাতালে/ক্লিনিকে রেফার করতে হবে যেখানে গর্ভবতীর অপারেশন বা রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে।

গ. প্রসবের আগে পরিকল্পনা করলে (অর্থাৎ, প্রসবের স্থান নির্বাচন, ব্যথা শুরু হলে দ্রুত হাসপাতালে/ক্লিনিকে নিতে আগে যানবাহন ঠিক করে রাখা, আগে থেকে টাকা জমানো ও রক্তদাতা ঠিক করে রাখা) মা ও শিশুর মৃত্যুঝুঁকি অনেকাংশে কমানো যায়।

ঘ. গর্ভবতী কিশোরী সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ– গর্ভকালীন, প্রসবকালীন বা প্রসব পরবর্তী সময়েও। তার রক্তস্বল্পতা থাকলে প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব বেশি হতে পারে। তাছাড়া সময়ের আগে প্রসব এবং বাঁধাপ্রাপ্ত প্রসব দুটোই বেশি ঘটে থাকে। এজন্য কিশোরীর প্রসব ব্যথা শুরু হলে তাকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে/ক্লিনিকে নিতে হবে।

যদি কিশোরী মায়ের ঝুঁকিসমূহ সেবা প্রদানকারী শনাক্ত করতে পারেন ও ঠিক সময়ে জরুরি প্রসূতি সেবাকেন্দ্রে রেফার করতে পারেন, তাহলে তা কিশোরী মায়ের জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কিশোরী মায়ের প্রসব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় হাসপাতাল ছাড়া কোনোভাবেই প্রসব করানো উচিত নয়। প্রয়োজনে কাছাকাছি সমন্বিত জরুরি প্রসূতি সেবা কেন্দ্রে রেফার করতে হবে।

ঙ. সেবা প্রদানকারীদের কিশোরীদের অবস্থা, সমস্যা ও চাহিদা বোঝে সে অনুযায়ী তথ্য, কাউন্সেলিং ও সেবা দিতে হবে। গর্ভবতী হলেও কিশোরীদের বৃদ্ধি চলছে বলে তার সমস্যা বড়দের থেকে বেশি, এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

চ. **প্রসব পরবর্তী যত্ন :** কিশোরী মায়েরা নিজের ও শিশুর যত্ন বিভিন্ন কারণে নিতে পারে না এবং অনেকসময় পারিবারিক সহায়তাও পায় না, তাই তাদের জন্য পারিবারিক সহায়তাসহ প্রসবপরবর্তী যত্ন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

স্লাইড ১২.৩

প্রসব পরবর্তী যত্ন

- মা ও নবজাতকের চেকআপ (কমপক্ষে ৪টি -১ম বার : প্রসবের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, ২য় বার: ২-৩ দিনের মধ্যে, ৩য় বার: ৪-৭ দিনের মধ্যে এ বং ৪র্থ বার: প্রসবের ৪২-৪৫ দিনের মধ্যে)
- প্রাথমিক অবস্থায় প্রসব পরবর্তী জটিলতা শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা
- মাকে ভিটামিন এ খাওয়ানো, শিশুকে শালদুধ ও শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো, মা ও শিশুর পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং শিশুর টিকা ও পরিচর্যা বিষয়ক তথ্য প্রদানসহ কাউন্সেলিং এই সময়ে করা হয়।

কিশোরীদের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে করণীয়সমূহ–

- কিশোরীদের মাতৃত্ব নিরাপদ করার লক্ষ্যে সময়মত চেকআপ, নিয়ম-কানুন মানা, টিকা নেয়া, প্রয়োজনে চিকিৎসা করা এবং হাসপাতালে/ক্লিনিকে প্রসব করানোর জন্য কিশোরী ও পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করা
- প্রসব পরিকল্পনা (প্রসবের স্থান নির্বাচন, ব্যথা শুরু হলে দ্রুত হাসপাতালে/ক্লিনিকে নিতে আগে যানবাহন ঠিক করে রাখা, আগে থেকে টাকা জমানো ও রক্তদাতা ঠিক করে রাখা) পারিবারিক ও জনসচেতনতা তৈরি করা
- প্রয়োজনে যানবাহন, টাকা ও রক্তদাতা জোগাড় করতে সহায়তা করা বা জোগাড় হয়েছে তা গ্রামভিত্তিক 'নিরাপদ মাতৃত্ব কমিটি' তৈরি করে নিশ্চিত করা
- কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন সভায় বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা।

অধিবেশন

১৩

কিশোরীদের অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধ ও গর্ভপাতপরবর্তী সেবা

অধিবেশন ১৩

কিশোরীদের অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধ ও গর্ভপাতপরবর্তী সেবা

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণ, পরিণতি ও প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।

২. অনিরাপদ গর্ভপাতের ব্যবস্থাপনা ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণ, পরিণতি ও প্রতিরোধ	২০ মিনিট	দলীয়/বাজগ্রুপ আলোচনা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ভিউকার্ড, মার্কার
৩	অনিরাপদ গর্ভপাতের ব্যবস্থাপনা ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা	১৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ১৩

কিশোরীদের অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধ ও গর্ভপাতপরবর্তী সেবা

অনিরাপদ গর্ভপাত

জ্ঞানের অভাবে, চাপে পড়ে, অসচেতন ও অপরিকল্পিতভাবে অনেক বিবাহিত ও অবিবাহিত কিশোর-কিশোরীর যৌন সম্পর্ক শুরু হয়। বেশিরভাগ বিবাহিত কিশোর-কিশোরী বয়স্কদের তুলনায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কম ব্যবহার করে থাকে আর অবিবাহিতরা পদ্ধতিসমূহ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়। এমন পরিস্থিতিতে কিশোরীরা অপরিকল্পিত/অবাঞ্চিত গর্ভধারণ এবং পরবর্তীতে গর্ভপাত করে থাকে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনিরাপদ। বিবাহিত হোক বা না হোক, কিশোর-কিশোরী উভয়েই অরক্ষিত যৌন সম্পর্কের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিণতির শিকার হয়, যেমন– অবাঞ্চিত গর্ভধারণ, সন্তানের জন্ম দেয়া, অনিরাপদ গর্ভপাত এবং যৌনবাহিত ও এইচআইভি/এইডসসহ অন্যান্য যৌন সংক্রমণ। বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে অনিরাপদ গর্ভপাতজনিত জটিলতার ঝুঁকি কমাতে মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর) ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা প্রদান অত্যন্ত জরুরি।

স্লাইড ১৩.১ঃ

অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণ

- বিয়ে বর্হিভূত সম্পর্কের অনৈতিকতা, লজ্জা ও অপবাদ ঢাকতে,
- অস্থায়ী সম্পর্ক শেষ করতে,
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার না করলে,
- জোরপূর্বক যৌনমিলন/ধর্ষণ করলে,
- শিশু পালনের অর্থনৈতিক সামর্থ্য না থাকলে,
- গর্ভধারণের ফলে স্কুল বা পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

অনিরাপদ গর্ভপাতের পরিণতি

অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণে মারাত্মক অসুস্থতা ও মৃত্যু ঘটে যার হার কিশোরীদের মধ্যেই বেশি। কারণ, তারা যে গর্ভবতী হয়েছে তা দেরিতে বোঝে ও সিদ্ধান্ত/চিকিৎসা নিতে দেরি করে, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর সাহায্য নেয় না এবং গর্ভপাতের জন্য বিপজ্জনক ও অনিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করে।

অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধ

বাংলাদেশে গর্ভপাত আইনগতভাবে অবৈধ। শুধু মায়ের জীবননাশের আশংকা থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী গর্ভপাত করানো যায়। তবে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের ক্ষেত্রে শেষ মাসিকের ১ম দিন থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবা প্রদানকারী ও ১০ সপ্তাহ পর্যন্ত চিকিৎসক, মাসিক নিয়মিতকরণ বা এমআর করাতে পারেন। অনিরাপদ গর্ভপাতের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও সেপসিস থেকে অনেক কিশোরী মৃত্যুবরণ করে এবং জটিলতার শিকার হয় যা মাসিক নিয়মিতকরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব। অনিরাপদ গর্ভপাত বন্ধ করতে হলে, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ অবশ্যই রোধ করতে হবে। এজন্য কমিউনিটি/জনগণ, সরকার ও সেবা প্রদানকারীদের যা করা উচিত–

- প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবার সুযোগ বাড়ানো
- নিরাপদ এমআর বা মাসিক নিয়মিতকরণ সেবাকে আরো সম্প্রসারিত ও সহজলভ্য করা
- সেবাদানকারীদের গর্ভপাত পরবর্তী সেবার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া
- কিশোর-কিশোরীদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

অনিরাপদ গর্ভপাতের ব্যবস্থাপনা

অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণে সংক্রমণ হলে, রোগীর জ্বর জ্বর ভাব/জ্বর, পেট ফোলা ও ব্যথা, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব ও অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং পানিস্বল্পতা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা পেতে দেরী হলে, কিশোরী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে ও তার স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। এজন্য কিশোরীর ইতিহাস নিয়ে ও সম্ভব হলে, প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা করে দ্রুত উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে রেফার করতে হবে যাতে তার জরায়ু পরিষ্কার করে জীবন বাঁচানো যায়।

গর্ভপাতপরবর্তী সেবা

ফলোআপের মাধ্যমে কিশোরীদের গর্ভপাত পরবর্তী যত্নের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কারণ, বয়স্ক মহিলাদের তুলনায় কিশোরীরা খুব কমই ফলোআপে আসে। তাদের সাথে সেবা প্রদানকারীর ভালো সম্পর্ক তৈরি হলে সেটা তাদের ফলোআপ প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করে। রোগীকে বিপজ্জনক চিহ্নসমূহ, যেমন- জ্বর, ঠান্ডায় কাঁপা, বমিভাব, বমি, পেট ও পিঠ ব্যথা, পেটে চাপ দিলে প্রচণ্ড ব্যথা, অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে। সঠিকভাবে জেনেশুনে যাতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এজন্য তাদের যৌন আচরণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক তথ্য অবশ্যই দিতে হবে।

অধিবেশন

১৪

কৈশোরকালীন জেন্ডার বৈষম্য, সহিংসতা/নির্যাতন ও যৌন হয়রানি– প্রতিরোধ এবং প্রতিকার

অধিবেশন ১৪

কৈশোরকালীন জেন্ডার বৈষম্য, সহিংসতা/নির্যাতন ও যৌন হয়রানি– প্রতিরোধ এবং প্রতিকার

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. জেন্ডার এবং জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য বলতে পারবেন।

২. জেন্ডার বৈষম্য ও সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

১. জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন প্রতিরোধ করতে করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	জেন্ডার, জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য, জেন্ডার বৈষম্য ও সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব	১৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন প্রতিরোধ করতে করণীয়	২০ মিনিট	রোল প্লে, আলোচনা	–
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ১৪

কৈশোরকালীন জেন্ডার বৈষম্য, সহিংসতা/নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং প্রতিকার

জেন্ডার বৈষম্য

জেন্ডার হচ্ছে সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য। সেক্স বা লিঙ্গ নারী ও পুরুষের মধ্যে জন্মগত শারীরিক পার্থক্যকে নির্দেশ করে। জন্ম থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে লিঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য না থাকলেও পরবর্তিতে সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষের আচরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায় যেগুলো পরিবার, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক নিয়মকানুন দ্বারা প্রভাবিত।

সমাজে নারী ও পুরুষকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং তাদের কাছ থেকে ভিন্ন আচরণ আশা করে। এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জেন্ডার বৈষম্যের সৃষ্টি হয় যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। জেন্ডার বৈষম্য পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রথা, নিয়ম, আইন ও সংস্কৃতি– সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। জেন্ডার বৈষম্য শুধু নারীর সমঅধিকার ক্ষুণ্ন করেনি, নারীর স্বাস্থ্য ও অবস্থানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

স্লাইড ১৪.১

সেক্স বা লিঙ্গ	জেন্ডার
শারীরিক	সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক
সার্বজনীন বা সমগ্র বিশ্বে একই রকম	সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন
জন্মগত	সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সৃষ্ট
সাধারণত অপরিবর্তনশীল	ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করা যায়
স্থান, কাল, পাত্রভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না	স্থান, কাল, পাত্রভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়

সমাজ নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং সেই ভাবে আচরণ করে থাকে। এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জেন্ডার বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

সমাজে বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্য

- সমাজে সকল ক্ষেত্রে, যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এসব পাবার ক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অগ্রাধিকার
- পরিবারে কন্যাসন্তান থেকে পুত্রসন্তানের অধিক মূল্যায়ন
- পরিবারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি ও পুষ্টিকর খাবার খেতে দেয়া
- কন্যাসন্তানকে পড়াশোনা করাতে বাবা-মায়ের অনীহা, পুত্রের পড়াশোনার জন্য ব্যয় করা
- কন্যাসন্তানকে পরিবারের বোঝা মনে করে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়া
- যৌতুক দাবি করা এবং যৌতুকের কারণে মেয়েদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা
- অসুস্থ হলে মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ব্যাপারে পরিবারের উদাসীনতা
- সন্তান গ্রহণ ও নিজের শরীর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে না পারার প্রথা
- কৈশোরে সন্তানধারণ করা
- নারীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন খুব স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করা
- পুরুষের তুলনায় নারীকে কম পারিশ্রমিক দেয়া
- নারী ও পুরুষের মাঝে সম্পদের অসম বিতরণ
- নিজ উপার্জনের ওপর নারীর অধিকার না থাকা
- কর্মক্ষেত্রে নারীর দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ না দেয়া

জেন্ডারের এই বৈষম্যকে পরিবার, সমাজ যখন মেনে নেয় ও আইন, নীতি বা মূল্যবোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র বৈধতা দেয় তখন তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং সেটি বৈষম্য হিসেবে রূপ লাভ করে।

স্লাইড ১৪.২ :

সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব

- নারী যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ বা সুযোগ-সুবিধা পায় না, ফলে পিছিয়ে পড়ে;
- নারীকে বোঝা হিসেবে দেখা হয়;
- সম্পদ ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব থাকে না;
- বাল্যবিবাহ, তালাক, যৌতুক ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়;
- নারী সহিংসতা, নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের শিকার হয়;
- নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়;
- পারিবারিক সিদ্ধান্ত নারীর বিপক্ষে যায়;
- নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায় না;
- নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অবস্থার উন্নতি হয় না;
- রক্তস্বল্পতা হয়
- প্রলম্বিত অসুস্থতা
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ
- মাতৃমৃত্যু
- গর্ভধারণ বিষয়ক জটিলতা থেকে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা;
- প্রজননতন্ত্রের প্রদাহ, যৌনরোগ
- মানসিক অসুস্থতা
- অকাল বার্ধক্য
- সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় কাজে এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ কম হয়।

সাম্য ও সমতার পার্থক্য

পরিবার, সমাজ ও রাস্ট্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীরা এখনও পিছিয়ে রয়েছে। তাই পুরুষের চেয়ে নারীকে বেশি সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাম্যের (Equity) মাধ্যমে জেন্ডার সমতা (Equality) আনতে হবে।

জেন্ডার বৈষম্য দূর করার জন্য করণীয়

দীর্ঘদিনের সংস্কার, অসচেতনতা, প্রথা ইত্যাদি দ্বারা চালিত হয়ে আমরা নারী ও পুরুষকে প্রচলিত বা গতানুগতিক যে ভূমিকাগুলোতে দেখে থাকি এবং সে অনুযায়ি আচরণ করি তার মধ্যে কতটা যুক্তিসংগত আর কতটা বৈষম্যমূলক? জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন। সেক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো করা উচিত সেগুলো হচ্ছে ঃ

- জেন্ডার বৈষম্য রোধে সমাজের সকল স্তরে সচেতনতার সৃষ্টি করা
- নারী শিক্ষা, নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ, নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ নারীর জন্য সকল মানবাধিকার নিশ্চিত করা
- পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও চাকরি ও ব্যবসাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি দক্ষ নারীশক্তি গড়ে তোলা
- দক্ষতা অনুসারে সকল কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- নারীর অধিকার রক্ষায় সকল প্রকার আইনি সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা
- নারী ও পুরুষের সমতা বজায় রাখার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা
- নারীকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য দেশের প্রচলিত আইনের প্রয়োগ করা

নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন

জেন্ডার বৈষম্যের কারণে সমাজে বিভিন্নভাবে কিশোরী/ নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন দেখা যায়। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে কিশোরীদের চলাচল কমে যায়, অল্প বয়সে তার সম্মতি ছাড়াই বিয়ে হয়ে যায়, ছেলেসন্তানের চেয়ে মেয়েসন্তানের শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও মতামতের কম গুরুত্ব দেয়া হয় ইত্যাদি। এমন অনেক বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার কারণে কিশোরীরা শারীরিকও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। অনেক কিশোরও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

পরিবারে ও স্কুলে অবাধ্য সন্তান/ ছাত্র-ছাত্রীকে শারীরিক শাস্তি দিয়ে শাসন করা, যৌতুক ও অন্যান্য কারণে কিশোরীর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া, বাসা-বাড়িতে কাজ করতে এসে কিশোরীর গৃহকর্তা/ কর্ত্রী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হওয়া, প্রেম বা বিয়ের/ যৌন সম্পর্কের প্রস্তাবে রাজি না হলে এসিড নিক্ষেপ করা বা ধর্ষণ করা, নারীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতকরণ, তার নিজস্ব অর্জিত সম্পত্তি আত্মসাৎ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বা লুকানো ক্যামেরার মাধ্যমে নগ্ন শরীরের ভিডিও করে বা ছবি তুলে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়া, কিশোরী/ নারী পাচার ও পতিতা বৃত্তিতে বাধ্য করা– এসবই নারীর প্রতি সহিংসতার উদাহরণ।

এছাড়াও শিশু ও কিশোর-কিশোরী পরিবার, বন্ধু ও পরিচিত মানুষ দ্বারা যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়। বুঝতে না পারা ও লজ্জার কারণে এ নির্যাতনের কথা প্রকাশ পায় না। সম্মতি ছাড়া যৌন মিলনের কারণে অনেক বিবাহিত কিশোরী/ মহিলাও ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। স্কুল, কলেজ, কারখানা, অফিসে এমনকি রাস্তায়ও কিশোরী বা নারীরা পুরুষের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়।

স্লাইড ১৪.৩:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার কর্মসূচি

- নয়টি মেডিকেল কলেজে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার,
- চল্লিশটি জেলা পর্যায়ে ও বিশটি উপজেলা পর্যায়ে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল,
- ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (হটলাইন ১০৯৮) ও জয় অ্যাপস,
- মেডিকেল কলেজে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন, নির্যাতিতদের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ ও নির্যাতনবিরোধী গণসচেতনতা কার্যক্রম।

জেন্ডারভিত্তিক শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন

আমাদের সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। তবে শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতনের খবরগুলোই প্রচার মাধ্যমে বেশি প্রচার হয়ে থাকে।

- মানসিক নির্যাতন
- শারীরিক নির্যাতন
- যৌন নির্যাতন
- যৌন হয়রানি
- এসিড নিক্ষেপ
- মানসিক নির্যাতন
- আর্থিকভাবে নির্যাতন
- নারী পাচার

পতিতাবৃত্তি

- পর্ণোগ্রাফি ও অশ্লীল প্রকাশনা
- সাইবার ক্রাইম
- ইভটিজিং

জেন্ডার বৈষম্য ও নারীর প্রতি সহিংসতা/নির্যাতন প্রতিরোধে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে–

- নিজেদের রক্ষার জন্য কিশোরীদের জীবন দক্ষতা শিক্ষা ও শারীরিক দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ দেয়া
- বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জনমত তৈরি করা
- সামাজিক নিরাপত্তা ও আইন জোরদার করা
- নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল হতে পরিবার ও সমাজকে সচেতন করা এবং জেন্ডার শিক্ষা দেয়া
- ঐক্যবদ্ধভাবে অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিকদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা
- সরকার কর্তৃক ধর্ষকের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা
- দ্রুত ধর্ষণের শাস্তির ব্যবস্থা এবং শাস্তির বিষয়টি জোরেশোরে প্রচারের ব্যবস্থা করা
- সমাজের সকল স্তরের নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করা।

অধিবেশন

১৫

কৈশোরে মানসিক স্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ

অধিবেশন ১৫

কৈশোরে মানসিক স্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. কৈশোরে মানসিক স্বাস্থ্য ও গুরুত্ব বলতে পারবেন।

২. কৈশোরে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ ও কারণ বলতে পারবেন।

৩. কিশোর-কিশোরীদের মানসিক সমস্যা ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	কৈশোরে মানসিক স্বাস্থ্য, ঝুঁকির্পূণ আচরণ ও কারণ	১৫ মিনিট	দলীয় আলোচনা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	কিশোর-কিশোরীদের মানসিক সমস্যা ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে উত্তরণের উপায়	২০ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ভিপকার্ড, মার্কার, টেপ
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ১৫

কৈশোরে মানসিক স্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ

স্লাইড ১৫.১ :

কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য

- কৈশোরকালীন সময়ে মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মনোস্তাত্ত্বিক কর্মক্ষমতা ও কল্যাণ অর্জন করা এবং সেগুলো ধরে রাখার সক্ষমতা।
- নিজস্বতা, আত্মবিশ্বাস, পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সুস্থ সম্পর্ক, শেখা ও কর্মক্ষম হওয়ার সক্ষমতা এবং উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সমস্যা ও সম্ভাবনাকে ব্যবহার করার দক্ষতা কৈশোর মানসিক স্বাস্থ্যের অর্ন্তভুক্ত।
- সর্বোচ্চ মনোস্তাত্ত্বিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীল সামাজিক সম্পর্ক, কার্যকরী শিক্ষা, আত্ম-উন্নয়নের প্রচেষ্টা/ সক্ষমতা ও শারীরিক সুস্বাস্থ্য– সবগুলোর জন্য প্রয়োজন মানসিক সুস্বাস্থ্য।

কিশোর-কিশোরীদের শরীরের মত এসময় তাদের মানসিক অবস্থাও নাজুক থাকে যা প্রতিকুল পরিবেশ বা সহায়তা না পেলে অতি সহজে যে কোনো সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কর্মক্ষমতা কমে গেলে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ ও উপসর্গ দেখে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক সমস্যা চিহ্নিত করা যায়। ফলাফল হিসাবে তাদের মধ্যে বিষণ্নতা, সহিংসতা, আত্মহত্যা, নিষেধ অমান্য/অন্যায় করার প্রবণতা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক সমস্যা দেখা দেয়।

স্লাইড ১৫.২ :

কিশোর-কিশোরীদের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ

- মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (হতাশা, অস্থিরতা, ধ্বংসাত্মক আচরণ ইত্যাদি)
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা (যৌনবাহিত সংক্রমণ/এইচআইভি/এইডস/ অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক)
- মাদক ব্যবহার ও অন্যান্য আসক্তি (তামাক, অ্যালকোহল, অন্যান্য মাদক, পর্নোগ্রাফি, গেম, ফেসবুক)
- বিভিন্ন ধরনের অপরাধ, যৌন হয়রানি ও নির্যাতন, বুলিং করা
- ‘হিরো’ হতে চাওয়া– এজন্য দ্রুত ড্রাইভিং, অনিরাপদ যৌনমিলন ইত্যাদি করা
- ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহার
- ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত আঘাত
- পুষ্টিগত সমস্যা
- জঙ্গীবাদের সাথে যুক্ত হওয়া

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা সঠিক তথ্য ও নির্দেশনা না পেয়ে নানারকম সমস্যায় আক্রান্ত হয় যা তাদেরকে আরও বেশি করে সমস্যার গভীরে ঠেলে দেয়।

স্লাইড ১৫.৩ঃ

কিশোর-কিশোরীদের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের কারণ

- বয়সভিত্তিক বৃদ্ধি ও হরমোনের প্রভাবে লজ্জা, নতুনকে জানা ও পরীক্ষা করার ইচ্ছা
- কৈশোরকালীন পরিবর্তনের কারণ ও প্রক্রিয়া না জানা
- মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে সমস্যার কারণে কিশোর বয়সে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠা
- পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি
- পারিবারিক মূল্যবোধ ও সামাজিক শিক্ষার অভাব
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও বন্ধুদের প্রভাবে মানসিক সমস্যা বা অস্থিরতা
- কিশোর-কিশোরীরা আবেগ দমন করতে না পারা
- মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার
- নানামুখী বিপণন ব্যবস্থা
- সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে বা খাপ খাওয়াতে না পারা

কিশোর-কিশোরীদের মানসিক সমস্যা ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে উত্তরণের উপায়ঃ

১) **পারিবারিক শিক্ষা:** পারিবারিক অনুশাসনের ঘাটতি ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রভাবেই কিশোর-কিশোরীরা ভুল পথে পা দিচ্ছে। পরিবারে কিশোর-কিশোরীদের সাথে যা আচরণ করা উচিত–

- কিশোর-কিশোরীদের মূল্যবোধ বুঝতে সাহায্য করা
- তাদের সাথে অভিভাবকসুলভ আচরণ না করে বন্ধুসুলভ আচরণ করা
- তাদের সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করা ও সঠিক শিক্ষা দেয়া যেমন-নিরাপদ যৌন আচরণ, ইন্টারনেটের নিরাপদ ও সঠিক ব্যবহার
- কিশোর সন্তানকে প্রত্যেকটা বিষয়ের ভাল এবং মন্দ পরিণতিগুলো মূল্যায়ন করতে সাহায্য করা
- তাকে বাস্তব অবস্থা বুঝিয়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা সঠিক তথ্য ও নির্দেশনা না পেয়ে নানারকম সমস্যায় আক্রান্ত হয় যা তাদেরকে আরও বেশি করে সমস্যার গভীরে ঠেলে দেয়।

২) **নৈতিকতা/মূল্যবোধ শিক্ষা**

- পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষাও কিশোর কিশোরীদের বিষয়গুলো জানতে, অনুশীলন করতে, সাহায্য করতে পারে, যা ভবিষ্যতে তাদের অপরাধপ্রবণতাসহ অন্যান্য নেতিবাচক আচরণ দূর করতে/ কমাতে পারে।
- শিক্ষকরা ক্লাশে বিভিন্ন বিষয় আলোচনার সময় নৈতিকতার দিকগুলোও তুলে ধরে তাদের সেগুলো করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

- অপরাধ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধে সচেতন মানুষ গড়ে তোলা গেলে এ ধরনের অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে যা সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠনে অবদান রাখবে।

৩) জীবনদক্ষতা শিক্ষা

- কিশোর কিশোরীদের জীবনদক্ষতা বিষয়ক শিক্ষা তাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- জীবনদক্ষতা হচ্ছে প্রতিদিনকার জীবনের সমস্যা ও চাহিদা বুঝে সেগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা। এ কাজগুলো আমরা প্রতিনিয়ত করি কিন্তু হয়তো খেয়াল করি না। যেমন– নিজেকে জানা, কার্যকরী যোগাযোগ, সমঝোতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান, আবেগ ও বন্ধুদের চাপে টিকে থাকা, 'না' বলতে পারা, গভীরভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করা। এগুলোর কোনটিই কঠিন নয় যদি তা বুঝে ব্যবহার করা যায়।
- এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে (শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাধ্যমে) ও সামাজিকভাবে (কিশোর কিশোরীদের দলের মাধ্যমে যেখানে পিয়ার এডুকেটর শিক্ষা দিতে পারে) জীবন দক্ষতা বিষয়ক শিক্ষা দেয়া যায়। বর্তমানে কিছু বিষয় মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলামে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে যা এই শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।
- পাশাপাশি পারিবারিকভাবেও জীবনদক্ষতা বিষয়ক শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য নানারকম সুযোগ দিতে ও উৎসাহিত করতে হবে।

উপরোক্ত উপায়ে কৈশোরকালীন সময়ে যেমন নিজেদের তৈরি করা যায়, তেমনি নিজেদের সংযতও রাখা যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা স্বাভাবিক। তবে মনে রাখতে হবে মানুষ হিসেবে আমাদের বিভিন্ন আবেগ থেকে নিজেকে সংযত রাখা একটা বড় দায়িত্ব। অনেক সময় কিশোররা সামাজিক বা ধর্মীয় অনুশাসন ভুলে বিপথগামী হয় ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে, যেমন–

- কয়েকজন কিশোর একসাথে হয়ে স্কুল কলেজের সামনে বা রাস্তাঘাটে মেয়েদেরকে আজেবাজে কথা বলে বা শীষ দিয়ে যৌন হয়রানি করে।
- সুযোগ পেলে মেয়েদের বিভিন্ন স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দেয়।
- কিশোর বয়সে যৌনবোধ হলে অনেকে বলপ্রয়োগ করে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিত কারো সাথে যৌন সম্পর্ক বা ধর্ষণ করে।
- অনেকে খারাপ বন্ধুদের প্ররোচনায় পতিতালয়ে যায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এর ফলে বিভিন্ন যৌনরোগ এবং এইচআইভি/এইডস হতে পারে। তাছাড়া জানাজানি হলে পরিবারের সদস্যরা সমাজের কাছে হেয় হয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে উপরের প্রত্যেকটি কাজই অন্যায়। এজন্য এসব খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। পাশাপাশি পরিবারের সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা, ভালো বই পড়া, সাংস্কৃতিক কাজে অংশগ্রহণ করা, খেলাধুলা করা ও বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

অধিবেশন

১৬

মাদকাসক্তি– পরিণতি ও প্রতিরোধ

অধিবেশন ১৬

মাদকাসক্তি– পরিণতি ও প্রতিরোধ

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. মাদকাসক্তির সংজ্ঞা, কারণ ও লক্ষণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

২. মাদকাসক্তির পরিণতি ও প্রতিরোধ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	মাদকাসক্তি : সংজ্ঞা, কারণ ও লক্ষণসমূহ	১৫ মিনিট	দলীয় আলোচনা, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ভিপকার্ড, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	মাদকাসক্তির পরিণতি ও প্রতিরোধ	২০ মিনিট	কেস ষ্টাডি, আলোচনা	কেস ষ্টাডি, মাল্টিমিডিয়া
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ১৬

মাদকাসক্তি– পরিণতি ও প্রতিরোধ

মাদক হলো এমন কোনো দ্রব্য যেগুলো ব্যবহার করলে ব্যবহারকারীর নেশা হয়ে যায়, তখন ঐ দ্রব্যগুলো না নিলে নানা রকম মানসিক ও শারীরিক সমস্যা হয়। এই অবস্থাই হচ্ছে মাদকাসক্তি। সারা বিশ্বে কিশোর-কিশোরী ও যুবসমাজের মধ্যে মাদক ব্যবহারের হার বেশি। মাদক হিসেবে সিগারেট, খাওয়ার তামাক, গুল, গাঁজা, ভাং, মদ, বিয়ার, হিরোইন, মরফিন, আফিম, প্যাথেডিন, ইয়াবা বড়ি, কোকেইন পাউডার, প্লাষ্টিক পোড়ানো ধোঁয়া, টিকটিকির লেজ, খাট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া ঘুমের ঔষধ, ফেনসিডিল খেলেও নেশা হয়।

মাদকদ্রব্য সাধারণত মুখে, ধুমপান বা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ও ইনজেকশনের মাধ্যমে নেয়া হয়। নিয়মিত মাদক ব্যবহারকারীরা একটি মাদকে সীমাবদ্ধ থাকে না, একাধিক মাদক ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়।

স্লাইড ১৬.১ :

মাদকাসক্তির কারণ

- দলগত বা বন্ধু-বান্ধবের চাপে
- নতুন কিছু করার/ জানার আগ্রহ ও ঝুঁকি নেবার প্রবণতা
- অনুকরণ করার প্রবণতা, বিশেষ করে কিশোরদের 'হিরো' হতে চাওয়া
- মাদকের সহজলভ্যতা
- মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা (পারিবারিক অশান্তি বা অভাবের কারণে)
- মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা।

স্লাইড ১৬.২ :

মাদকাসক্তির লক্ষণসমূহ

- হঠাৎ আচরণের পরিবর্তন, যেমন– অল্পতে রেগে যাওয়া, পরিবার বা অন্য কারো গায়ে হাত তোলা, একা একা থাকা, হাতখরচ বেড়ে যাওয়া, বন্ধু পরিবর্তন, ক্রমাগত মিথ্যা বলা
- ঘুমঘুম ভাব, অসংলগ্ন কথা বলা, এলোমেলো ভাবে হাঁটা, চোখ লাল হয়ে থাকা, দাঁত হলুদ ও ঠোঁট কালো হয়ে যাওয়া
- দূর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, মুখে এবং কাপড়ে গন্ধ, বমিবমি ভাব, বমি হওয়া
- ঘুম না হওয়া, ঘেমে যাওয়া, ঠোঁট ও মুখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া, শরীরে বিভিন্ন জায়গায় সূঁচ ফোটানোর দাগ
- অরুচি বা অল্প খাওয়া, শরীর শুকিয়ে যাওয়া, উদ্যমহীনতা
- ভীষন ছটফট করা (মাদক ব্যবহার করতে না পারলে)।

স্লাইড ১৬.৩ :

কেস স্টাডি

হাসানের সাথে কবিরের বন্ধুত্ব অনেক দিনের। দু'জনেই সেভেনে পড়ে, একসাথে থাকে। কবির গরীব ও হাসান ধনী হলেও তাদের মধ্যে এ নিয়ে কোন সমস্যা নেই। কবিরের মা-বাবা দু'জনেই হাসানকে স্নেহ করেন। তার মা নেই আর বাবা আবার বিয়ে করেছেন– তাই বাড়ীতে আদর-যত্ন করার মত কেউ নেই। এজন্য তার মন প্রায়ই খারাপ থাকে। তবে গতকাল থেকে কবির খেয়াল করছে যে হাসানের ফুরফুরে মেজাজ যা সে কখনো দেখেনি। জিজ্ঞাসা করলেও হাসান অস্বীকার করে এড়িয়ে গেল। তাতে কবিরের মনটা খারাপ হলেও আর কিছু বললো না।

এক সপ্তাহ পার হয়ে যাচ্ছে অথচ কবির হাসানের সাথে কথা বলা তো দূরের ব্যাপার, দেখাই পাচ্ছে না। মনে মনে ভীষণ রেগে গেল কবির। এর মধ্যে হাসানের বাবা কবিরকে স্কুল শেষে রাস্তায় দেখে হাসান কোথায় তা জানতে চাইলেন। কবির অবাক হয়ে উত্তর দিল যে সে জানে না। হাসানের বাবা খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন ও কবিরকে খবর নিতে বললেন হাসানের ব্যাপারে। পরদিন স্কুল শেষে কবির হাসানের পিছু পিছু যেতে লাগলো। স্কুল থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটি ভাঙ্গা বাড়িতে ঢুকলো হাসান। কবির উঁকি দিয়ে দেখলো কয়েকটা খারাপ ছেলের সাথে হাসান আড্ডা দিচ্ছে ও ইনজেকশন নিচ্ছে। এবার কবির বুঝতে পারলো যে হাসান নেশার সর্বনাশা জগতে পা বাড়িয়েছে। দেরি না করে কবির হাসানের বাবাকে জানালো পুরো ঘটনা।

হাসানের বাবা এবার হাসানকে ঘরে আটকে রাখলেন। কবির তার সাথে দেখা করতে গেল। কবির হাসানের ঘরে ঢুকে দেখলো হাসানের সারা শরীর কাঁপছে। হাসান কবিরকে তাড়াতাড়ি ইনজেকশন এনে দিতে বললো, সে আর কষ্ট সহ্য করতে পারছে না। হাসানের বাবা খবর পেয়ে ডাক্তার ডাকলেন। ততক্ষণে হাসানের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, ডাক্তার সবই বুঝতে পারলেন। তিনি চিকিৎসার জন্য হাসানকে দ্রুত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করতে বললেন।

অনেক জোর করে হাসানকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা হলো এবং চিকিৎসাও শুরু হলো। আস্তে আস্তে হাসান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। বাড়ী ফিরে যখন কবিরের সাথে দেখা হলো, তখন হাসান কবিরকে জড়িয়ে ধরলো। কবিরই তাকে মরণ নেশার পথ থেকে বাঁচিয়ে এনেছে, পরম বন্ধুর মত কাজ করেছে।

আলোচনার জন্য প্রশ্ন :

১. কেন হাসান মাদকাসক্ত হলো?

২. আটকে রাখার পর হাসানের কি হয়েছিল?

৩. এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় দিক কী কী?

স্লাইড ১৬.৪ :

মাদকাসক্তির পরিণতি

- দুর্ঘটনা, পানিতে ডুবে যাওয়া
- পারিবারিক অশান্তি,
- সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া,
- পড়াশোনার ইতি টানা, চাকুরী ও উপার্জন হারানো
- অপরাধ প্রবণতা ও সহিংসতা
- স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, খিটখিটে মেজাজ
- মানসিক চাপ/ বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যা
- এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়া
- শরীরে অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া (যেমন– লিভার, ফুসফুস, স্নায়ু ইত্যাদি)
- দীর্ঘমেয়াদে যৌন আবেদন কমে যাওয়া ইত্যাদি

কিশোর-কিশোরীদের মাদক ব্যবহার প্রতিরোধে করণীয়

মা-বাবার ভূমিকা	সামাজিক ভূমিকা
■ সন্তানের সাথে মা-বাবার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা ■ তাকে মানসিক সহায়তা দেয়া ও গতিবিধি লক্ষ্য রাখা ■ প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ■ তাকে সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত করা **শিক্ষকের ভূমিকা** ■ মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝানো ■ মাদক দ্রব্যের কুফল সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষ্কার ধারণা দেয়া ■ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলার মতো বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত করা	■ মাদক ব্যবহারে ক্ষতি/পরিণতি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ■ কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও শিক্ষামূলক/গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা ■ অবৈধ মাদক ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারণা ■ প্রকাশ্যে জন সমাবেশে ধুমপান বন্ধ করা ■ আফিম, গাজা, ভাং– আমদানী, বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা ■ তামাকের বিপণন কার্যক্রম বন্ধে আইন করা ■ লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে শিরায় ঔষধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ ■ মাদকাসক্তদের জন্য নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন ও দলীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

অধিবেশন

১৭

কৈশোরে যৌনবাহিত ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস

অধিবেশন ১৭

কৈশোরে যৌনবাহিত ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. যৌনবাহিত সংক্রমণ ও এইচআইভি/এইডস: কারণ ও করণীয় বলতে পারবেন।

২. প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ: কারণ ও করণীয় বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	যৌনবাহিত সংক্রমণ ও এইচআইভি/এইডস : কারণ ও করণীয়	১৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লাশকার্ড, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ : কারণ ও করণীয়	২০ মিনিট	দলীয় আলোচনা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া পোস্টার, মার্কার, টেপ
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ১৭

কৈশোরে যৌনবাহিত ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস

যৌনবাহিত সংক্রমণ কি?

যৌন মিলনের মাধ্যমে একজন যৌন রোগে আক্রান্ত ব্যাক্তি থেকে অন্যজনের মধ্যে যে সকল সংক্রমণ ছড়ায় সেগুলোই 'যৌনবাহিত সংক্রমণ'। তবে কিছু কিছু যৌনবাহিত সংক্রমণ জীবাণুযুক্ত রক্ত ব্যবহারের ফলে কিংবা যৌন রোগে আক্রান্ত মা থেকে তার গর্ভের শিশুর মধ্যেও ছড়াতে পারে।

স্লাইড ১৭.১ :

যৌনবাহিত সংক্রমণ

- যৌন মিলনের মাধ্যমে একজন যৌনরোগে আক্রান্ত ব্যাক্তি থেকে অন্যজনের মধ্যে যে সকল সংক্রমণ ছড়ায় সেগুলোই 'যৌনবাহিত সংক্রমণ'। তবে কিছু কিছু যৌনবাহিত সংক্রমণ জীবাণুযুক্ত রক্ত ব্যবহারের ফলে কিংবা যৌনরোগে আক্রান্ত মা থেকে তার গর্ভের শিশুর মধ্যেও ছড়াতে পারে।
- এখানে উল্লেখ্য যে, উন্নয়নশীল এবং উন্নত উভয় দেশেই কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমণের হার বেড়েই চলেছে। যৌনবাহিত সংক্রমণ বিশ্বের সকল রোগের মধ্যে একটি অন্যতম রোগ, যার প্রভাব বহু পুরুষ, মহিলা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং সমাজ ও অর্থনীতির ওপর পড়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনরোগের লক্ষণ বোঝা যায় না। বিশেষ করে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের এই লক্ষণগুলো অপ্রকাশিত থাকে, তাই চিকিৎসা নিতে তারা অনেক দেরি করে ফেলে যা থেকে জটিলতাও হতে পারে।

স্লাইড ১৭.২ :

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ

- প্রজনন অঙ্গসমূহের সংক্রমণকে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বলে।
- যৌন সম্পর্ক (যৌনবাহিত সংক্রমণ) ছাড়াও বিভিন্নভাবে (সংক্রমিত রক্ত/ রক্তজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ, সংক্রমিত সূঁচ বা যন্ত্রপাতি ও আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে) প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে।

এইচআইভি/এইডস

এইচআইভি কিভাবে ছড়ায়

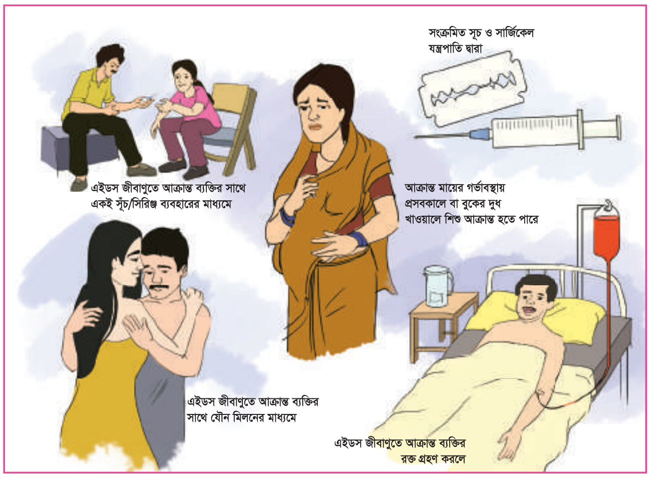

এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় না

পৃথিবীতে দিন দিন এইচআইভি মহামারি আকার ধারণ করছে। এর প্রকোপ কমবয়সি, তুলনামূলক ভাবে দরিদ্র এবং নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে। সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর (যেমন– শিরায় মাদকসেবী, যৌনকর্মী ইত্যাদি) মধ্যে বেশীর ভাগই কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী। তাই কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরাই হলো মূল জনগোষ্ঠী যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম চালানো উচিত।

স্লাইড ১৭.৩ঃ

এইচআইভি/এইডস নিয়ে রোল প্লে

এতে একজন অল্পবয়সে বিবাহিত কিশোরী, তার বয়স্ক স্বামী, প্রতিবেশী মহিলা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

অল্পবয়সে বিবাহিত কিশোরী প্রায়ই অসুস্থ থাকার কারণে সংসারের কাজ-কর্ম করতে পারে না বিধায় তার বয়স্ক স্বামী অনেক অত্যাচার-নির্যাতন করে। একদিন মার খেয়ে কিশোরী অজ্ঞান হয়ে গেলে খবর পেয়ে পাশের বাড়ীর মহিলা দেখতে আসে এবং কিশোরীর স্বামীকে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকর্মীকে ডাক দিতে বলে। স্বাস্থ্যকর্মী এসে কিশোরীকে পরীক্ষা করে ও হাসপাতালে নিতে বলে। প্রথমে আপত্তি করলেও কিছুক্ষণ পর কিশোরীর স্বামী রাজী হয়। হাসপাতালে ভর্তি হলে ডাক্তার দেখেন ও সকল পরীক্ষা করা হয়। তারপর ডাক্তার কিশোরীর স্বামীকে ডেকে পাঠান ও জানান যে কিশোরী এইচআইভি পজিটিভ। প্রশ্ন করে ডাক্তার জানতে পারেন যে কিশোরীর স্বামীও এইচআইভি পজিটিভ যা সে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল। তখন ডাক্তার তাকে এইচআইভি/এইডস কি, কিভাবে ছড়ায় ও ছড়ায় না এবং প্রতিরোধ/ করণীয় সম্পর্কে জানাবেন।

প্রশ্ন ও আলোচনা

- এইচআইভি/এইডস কি
- কিভাবে ছড়ায়
- কিভাবে ছড়ায় না
- কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়

এইচআইভি/এইডস কিভাবে ছড়ায়?

চারটি উপায়ে এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এগুলো হলো–

স্লাইড ১৭.৪ :

এইচআইভি/এইডস কিভাবে ছড়ায়?

- এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে
- এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত ও রক্তজাত সামগ্রী শরীরে প্রবেশ করলে
- সংক্রমিত সূঁচ বা অপরিশোধিত সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে
- এইচআইভি আক্রান্ত মা থেকে শিশুর শরীরে

স্লাইড ১৭.৫ :

এইচআইভি/এইডস কিভাবে ছড়ায় না?

- সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত গ্লাসে পানি পান করলে
- সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত পুকুর বা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটলে
- সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত চুষে কোন মশা সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে
- সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে সামাজিক মেলামেশা বা অবস্থান করলে
- সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত টয়লেট ব্যবহার করলে
- সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে করমর্দন করলে
- সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে আলিঙ্গন/চুম্বন করলে
- সংক্রমিত ব্যক্তির কাপড় বা বাসনপত্র ব্যবহার করলে
- সংক্রমিত ব্যক্তির কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে।

এইচআইভি ও যৌনবাহিত সংক্রমণসমূহের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

এইচআইভি প্রতিরোধ কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, কারণ যৌনবাহিত সংক্রমণ এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। চিকিৎসা না করালে যৌনবাহিত সংক্রমণের উপস্থিতি এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। যৌনবাহিত সংক্রমণের সঠিক ব্যবস্থাপনা সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৪০% এইচআইভি সংক্রমণের হার কমাতে পারে (সূত্র : WHO 2001 STIs Overview and Estimates)।

স্লাইড ১৭.৬:

কিশোর-কিশোরীদের এইচআইভি প্রতিরোধ

- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে
- বিবাহ বর্হিভূত যৌনমিলন থেকে বিরত থাকলে
- স্ত্রী বা সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে
- যৌন মিলনে সবসময় কনডম ব্যবহার করলে
- কেবলমাত্র অনুমোদিত ব্লাড ব্যাংক থেকে এইচআইভি পরীক্ষিত রক্ত গ্রহণ করলে
- যে কোনো ধরণের ড্রাগ ব্যবহার থেকে বিরত থাকলে : যদি আপনি একজন শিরায় মাদক গ্রহণকারী হয়ে থাকেন, যে কোনো ধরনের সুঁই (সিরিঞ্জ) জাতীয় বস্তু ভাগাভাগি করা থেকে বিরত থাকলে
- যে কোনো ধরনের যৌনবাহিত সংক্রমণ (এসটিআই)/ প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ (আরটিআই) পরীক্ষা করতে হবে এবং চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

অধিবেশন

১৮

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং ও রেফারাল

অধিবেশন ১৮

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং ও রেফারাল

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা

স্লাইড ১৮.১ :

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য গুনগত মানসম্পন্ন ও চাহিদামাফিক স্বাস্থ্যসেবা যা কিশোর-কিশোরীদের জন্য সহজলভ্য, গ্রহণযোগ্য, যথোপযুক্ত, সাশ্রয়ী, কার্যকরী ও নিরপেক্ষ। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ি সুবিধাজনক সময়ে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা বিনা বা স্বল্পমূল্যে এই সেবা প্রদান করা হয় যাতে তাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারের হার বাড়ে।

কৈশোরকালে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তারা অনেক সমস্যা ও ঝুঁকির মধ্যে বেড়ে ওঠে। পাশাপাশি পরিবার ও স্কুল-কলেজ থেকেও কোনো সহায়তা পায় না। অনেকেই চাপে পড়ে কিংবা না জেনে সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা তাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে এবং পরিবারে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে অল্প বয়সের কারণে তাদের শারীরিক ঝুঁকি যেমন বেশি থাকে, তেমনি মানসিক পরিবর্তনের কারণেও তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক পরামর্শ ও ধারণা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা তাদেরকে দুঃশ্চিন্তামুক্ত, স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন যাপনে সহায়তা করতে পারে।

কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি এবং বিকাশকে সঠিকভাবে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি (ও বেসরকারি) স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা শুরু করেছে। কৈশোরবান্ধব সেবার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা হয় যেখানে:

- কিশোর-কিশোরীগণ স্বচ্ছন্দে ও নিঃসংকোচে, সাশ্রয়ী মূল্যে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- সেবা প্রদানকারীগণ তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, সম্মানজনক ও নিরপেক্ষ আচরণ এবং অবিচারকমূলক মনোভাব প্রদর্শন করেন যাতে তারা মন খুলে সেবা প্রদানকারীকে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারে।
- কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা ছাড়াও বিভিন্ন মানসিক সমস্যা নিয়ে সেবা প্রদানকারীদের সাথে কথা বলা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেয়া যায়।
- প্রয়োজনীয় সেবা দিতে না পারলে পরবর্তী পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক সেবাদানকারীর কাছে/কেন্দ্রে রেফার করা হয়।
- কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

স্লাইড ১৮.২:

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানের বৈশিষ্ট্য (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা)

- সহজলভ্য
- সমতা
- গ্রহণযোগ্য
- যথোপযুক্ত
- পরিপূর্ণতা
- কার্যকরী
- দক্ষতা
- প্রাপ্তিসাধ্য

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান নিশ্চিত করতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করেছে:

- **সহজলভ্য:** সহজে সেবা পাওয়া যায়
- **সমতা:** বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক বা আর্থ-সামাজিক অবস্থা চিন্তা না করে প্রয়োজন অনুযায়ি সকল কিশোর-কিশোরীকে গুণগত মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করা
- **গ্রহণযোগ্য:** কিশোর-কিশোরীর প্রত্যাশা পূরণ হয় ও তারা সন্তুষ্ট থাকে
- **যথোপযুক্ত:** কিশোর-কিশোরীকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান নিশ্চিত করা
- **পরিপূর্ণতা:** কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিরোধ থেকে পুনর্বাসন এবং মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত সেবার ব্যবস্থা করা
- **কার্যকরী:** সেবাদানের মাধ্যমে রোগীর জীবন কিম্বা স্বাস্থ্যের অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন
- **দক্ষতা:** সম্ভাব্য কম খরচে দক্ষতার সাথে গুণগত মানসম্পন্ন সেবা প্রদান
- **প্রাপ্তিসাধ্য:** কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ তাদের নাগালের মধ্যে, চাহিদামাফিক ও সহজলভ্য হবে। সময়, দুরত্ব, খরচ, ব্যয়, সেবা দানকারীর মনোভাব এবং সেবাকেন্দ্রের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি কিশোর-কিশোরীদের অনুকুলে থাকবে।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবাসমূহ

একই সেবাকেন্দ্র থেকে কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের তথ্য ও সেবা দেওয়াই কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার উদ্দেশ্য। কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবাসমূহ নিম্নরূপ:

স্লাইড ১৮.৩:

ক্রমিক নং	তথ্য ও পরামর্শ/ কাউন্সেলিং সেবাসমূহ
১	বয়ঃসন্ধিকালীন শারিরীক ও মানসিক পরিবর্তন
২	খাদ্য ও পুষ্টি
৩	টিডি ও অন্যান্য টিকা
৪	সাধারণ ও মাসিক সংক্রান্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
৫	বাল্য বিবাহ ও অল্প বয়সে সন্তানধারণ প্রতিরোধ
৬	পরিবার পরিকল্পনা
৭	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার
৮	মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও নিরাময়
৯	অন্যান্য তথ্য ও পরামর্শ

স্লাইড ১৮.৪:

ক্রমিক নং	চিকিৎসা সেবাসমুহ ও অন্যান্য
১	যৌনবাহিত ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসা
২	মাসিক সংক্রান্ত সমস্যা ও ব্যবস্থাপনা
৩	সাধারণ রোগের চিকিৎসা
৪	রক্তস্বল্পতার চিকিৎসা ও আয়রন-ফলিক এসিড বড়ি বিতরণ
৫	গর্ভ সংক্রান্ত সেবা ও ব্যবস্থাপনা
৬	টিডি টিকা প্রদান
৭	পরিবার পরিকল্পনা সেবা-খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকশন, আইইউডি, ইমপ্ল্যান্ট
৮	মাসিক নিয়মিতকরণ ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবা
৯	রেফারাল (যেমন– এইচআইভি পরীক্ষা ও কাউন্সেলিং, মাদকাসক্তি নিরাময়, মারাত্মক জটিলতা)

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের স্থান

সরকারি পর্যায়ে জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের একটি কক্ষকে নির্বাচন করে বা জায়গা ঘিরে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উপযোগী করে সাজানো হয়েছে। এই কক্ষটিতে গোপনীয়তা বজায় রেখে একজন কিশোর বা কিশোরী স্বচ্ছন্দে ও নিঃসংকোচে সেবা প্রদানকারীদের সাথে তার সমস্যার কথা বলতে পারবে। কেন্দ্রের প্রবেশের মুখে এই কক্ষটির অবস্থান তীরচিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করা থাকবে যেন আগত কিশোর-কিশোরীরা সহজেই কক্ষটি খুঁজে পেতে পারে। কেন্দ্রের প্রবেশের মুখে কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত একটি সিটিজেন চার্টার টানানো থাকবে যাতে করে সকলে এই কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে জানতে পারে। সরকারি কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়েও কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ধাপসমুহ/ প্রক্রিয়া

কিশোর-কিশোরীরা কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আসার পর–

- **স্বাগত:** প্রথমে কিশোর বা কিশোরীকে স্বাগত জানাতে হবে এবং তাকে নির্ধারিত জায়গায় (কিশোর-কিশোরীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা) বসতে অনুরোধ করতে হবে।
- **রেজিষ্ট্রেশন:** নির্ধারিত রেজিষ্টার ব্যবহার করে কিশোর বা কিশোরীকে নথিভুক্ত করতে হবে।
- **সমস্যা জানা:** কিশোর বা কিশোরীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপের মাধ্যমে তার সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।
- **পরামর্শ/কাউন্সেলিং ও সেবা প্রদান:** তার সমস্যা বা প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে তাকে পরামর্শ/ কাউন্সেলিং ও সেবা প্রদান করতে হবে।

- **রেফারাল:** কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে প্রদান করা সম্ভব নয় এমন সেবার (যা কেন্দ্রের অন্য সেবাদানকারীর কাছ থেকে নিতে হবে অথবা অন্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পাঠাতে হবে) ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থানে রেফার করতে হবে। কিশোর বা কিশোরীর সাথে রেফারাল স্লিপ/কার্ড দিতে হবে যাতে বিস্তারিত সমস্যা লেখা থাকবে। একই কেন্দ্র হলে নিজে সাথে নিয়ে (সম্ভব হলে) তাকে উক্ত সেবা প্রদানের কক্ষ/স্থান চিনতে সহায়তা করা যেতে পারে। দূরের রেফারাল কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ঠিকানা, দূরত্ব ও যাতায়াতের সম্ভাব্য খরচ বলতে হবে। রেফার করার সাথে তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিতে হবে।
- **রেকর্ড কিপিং:** রেজিষ্টারের নির্ধারিত কলামগুলো পূরণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি সেবা ও পরামর্শের তথ্য যথাযথ ভাবে পুরণ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- **রিপোর্টিং:** প্রত্যেক মাসের নির্ধারিত সময়ে রিপোর্টিং ফরমেট ব্যবহার করে মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে হবে।

স্লাইড ১৮.৫:

কাউন্সেলিং ও এর গুরুত্ব

> কাউন্সেলিং একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারী, সেবা গ্রহীতাকে কোনো বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন।
>
> কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাউন্সেলিং-এর লক্ষ্য হচ্ছে সেবা গ্রহীতা হিসাবে কিশোর বা কিশোরীকে আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করা।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবায় কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া

কাউন্সেলিং, একক বা দলীয়ভাবে করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীর বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সমস্যা, যেমন - মাদকাসক্তি, স্কুল পালানো, ধ্বংসাত্মক আচরণ, হীনমন্যতা বা উচ্চমন্যতায় ভোগা, লেখাপড়ায় মনোযোগের অভাব, চুরি করা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি সমাধান করা সম্ভব। কাউন্সেলিং কিশোর-কিশোরীকে নিজেকে জানতে, নিজের সম্ভাবনাকে খুঁজে পেতে, নিজের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে ও সমস্যা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। এর ফলে কিশোর-কিশোরীরা নেতিবাচক আচরণ পরিববর্তন করে ইতিবাচক আচরণ করতে শুরু করে।

রেফারাল

রেফারাল হচ্ছে কোনো রোগীর যথাযথ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে অপর্যাপ্ত সুবিধা সম্পন্ন কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত সুবিধা সম্পন্ন বা উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণ করার ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি সেবাকেন্দ্রে সব ধরনের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা বা সেইসাথে সব ধরনের সেবা প্রদানের দক্ষতাসম্পন্ন সেবা প্রদানকারী নাও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ যে সেবাকেন্দ্রে আছে তাকে সেই সেবাকেন্দ্রে সময়মত প্রেরণ করাকে রেফারাল বলে। রোগীর জটিলতা এবং মৃত্যুঝুঁকি থাকলে রেফারালের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা করার মাধ্যমে চিকিৎসা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

স্লাইড ১৮.৬ঃ

রেফারাল ও এর গুরুত্ব

সেবাগ্রহীতার জন্য প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ যে সেবাকেন্দ্রে আছে তাকে সেই সেবাকেন্দ্রে সময়মত প্রেরণ করাকে রেফারাল বলে। কিশোর কিশোরীদের উন্নত ও অধিকতর সেবা প্রদানের জন্য কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে পরবর্তী পর্যায়ে রেফার করা হয়। যেমন–

- কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য দক্ষ জনবল না থাকলে
- চিকিৎসার জন্য অপর্যাপ্ত জায়গা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ অথবা যন্ত্রপাতি না থাকলে
- সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে না পারলে অথবা কেন্দ্রে আংশিক ব্যবস্থাপনা করা হলে
- রোগের জটিলতা ও বাড়তি চিকিৎসার (রক্ত সঞ্চালন ও অপারেশন) প্রয়োজন হলে
- উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য যথাযথ পরামর্শসহ দ্রুত নির্ধারিত উচ্চতর সেবাকেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

রেফারালের কেন্দ্র নির্বাচন

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রেফারাল কেন্দ্রের নাম, সেবার ধরন, সেবার পরিধি এবং যোগাযোগকারী কর্তৃপক্ষের জরুরি মোবাইল নম্বর সম্বলিত একটি তালিকা থাকবে, যেমন– উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র (উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে), জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং অন্যান্য বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র।

রেফার করার সময় সেবাপ্রদানকারীকে যা করতে হবে–

- ইতিহাস নেয়া ও শারীরিক পরীক্ষা করা
- কারণ উল্লেখ করে রেফারালের স্লিপ/কার্ড পূরণ করা
- জরুরী/প্রাথমিক চিকিৎসা/ব্যবস্থাপনা দেয়া
- রোগী এবং রোগীর পরিবারকে রেফারালের প্রয়োজনীয়তা ও ঝুঁকি সম্পর্কে কাউন্সেলিং করা
- রেফারাল কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করা (লোক মারফত বা ফোনে)
- যানবাহন ও রক্তদাতার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করা
- কেন্দ্রের বাইরে রেফারের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে রেকর্ড রাখা ও রেফারাল নোটের একটা কপি রাখা

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবায় রেফারাল করতে যা যা নিশ্চিত করতে হবে–

ক) কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবায় স্থানীয় জনগণ, পরিবার ও কমিউনিটি গ্রুপের সক্রিয় সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা

খ) রেফারাল কেন্দ্রে যাওয়ার ব্যবস্থা ও যানবাহন

গ) রোগী/অভিভাবকদের উপযুক্ত কাউন্সেলিং করতে সেবা প্রদানকারীদের যথাযথ জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা

ঘ) রেফারাল কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরবর্তী ফলোআপ

অধিবেশন

১৯

তথ্য সংরক্ষণ, সুপারভিশন ও মনিটরিং এবং রিপোর্টিং

অধিবেশন ১৯

তথ্য সংরক্ষণ, সুপারভিশন ও মনিটরিং এবং রিপোর্টিং

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. তথ্য সংরক্ষণ, মনিটরিং ও সুপারভিশনের সংজ্ঞা এবং এগুলোর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
২. কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে তথ্য সংরক্ষণ, মনিটরিং ও সুপারভিশন করার প্রক্রিয়া বলতে পারবেন।
৩. কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার সুপারভিশন চেকলিষ্ট পূরণ করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	তথ্য সংরক্ষণ, মনিটরিং ও সুপারভিশনের সংজ্ঞা এবং প্রয়োজনীয়তা	১৫ মিনিট	মুক্তচিন্তা, প্রদর্শন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লাশকার্ড, পোস্টার, মার্কার, টেপ
৩	কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা তথ্য সংরক্ষণ, মনিটরিং ও সুপারভিশনের প্রক্রিয়া এবং সুপারভিশন চেকলিষ্ট পূরণ	২০ মিনিট	দলীয় আলোচনা, প্রদর্শন, অনুশীলন, আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া সুপারভিশন চেকলিষ্ট
৪	মূল্যায়ন/ পুনরালোচনা	৫ মিনিট	প্রশ্ন-উত্তর	–

সহায়ক তথ্য ১৯

তথ্য সংরক্ষণ, সুপারভিশন ও মনিটরিং এবং রিপোর্টিং

তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি/ রিপোর্টিং

স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার পর সেই তথ্য লিখে রাখা ও প্রতিবেদন তৈরি করা এবং সেটা সুপারভাইজারকে পাঠানো সেবা দেয়ার মতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে দায়িত্ব হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা, তাদেরকে তথ্য ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের তথ্য রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা এবং তা থেকে মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করা। তারপর সেটা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন পাঠাতে হবে এবং অফিস কপি যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

সুপারভিশন ও মনিটরিং

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবার গুনগত মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর গুনগত মান পর্যবেক্ষণ করার জন্য সঠিক নিয়মে সুপারভিশন ও মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করতে হবে। এ জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যা ব্যবহার করে অগ্রগতি মনিটরিংও সেবার মান যাচাই করা যাবে। মান যাচাইয়ের ফলাফল ও তদনুযায়ী যাচাইকারীদের পরামর্শের উপর ভিত্তি করে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে এই কেন্দ্রটি কিশোর-কিশোরীদের জন্য আরও বেশি উপযোগী এবং কার্যকরী হয়ে ওঠে।

স্লাইড ১৯.১ :

সুপারভিশন বা তদারকি

এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কাজ সঠিকভাবে ও নির্ধারিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। সেই সাথে এ প্রক্রিয়ায় পরিলক্ষিত সমস্যা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তাৎক্ষণিকভাবে বা পরবর্তী সময়ে।

সুপারভিশনে কর্মীদের ও তাদের কাজের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এতে সেবা প্রদানকারী ও কর্মীদের কাজ সরেজমিনে দেখা এবং হাতেনাতে ভুল সংশোধনের ও সঠিকভাবে কাজটি কেমন করে করা যায় তা দেখানোর সুযোগ থাকে। কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও কাজের গুনগত মান নিশ্চিতকরণে এ প্রক্রিয়া সহায়ক।

স্লাইড ১৯.২ :

মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ

এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মীদের সম্পাদিত কাজের ফলাফল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা এবং সে ফলাফল কর্মীদেরকে জানানো যায়। কাজসমূহ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখাই মনিটরিং।

মনিটরিং-এর ফলে কর্মীরাও বুঝতে পারে পরিকল্পনা অনুযায়ি প্রত্যাশিত ফল অর্জন হচ্ছে কিনা। মনিটরিং সবসময় সরেজমিনে না করলেও চলে; মাসিক রিপোর্টে পূর্ববর্তী ও বর্তমান ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে কার্যক্রমের অগ্রগতি না নিম্নগতি হচ্ছে কিনা তা বোঝা যায় ও এর উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা যায়। কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে পাঠানো মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসেই আগের মাসের প্রতিবেদনের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে যে সম্পাদিত কাজের গতি উর্ধ্বমুখী না নিম্নমুখী। কাজের নিম্নগতি হলে কাজের গতি বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সুপারভিশন ও মনিটরিং কিভাবে হবে/ প্রক্রিয়া

জেলা পর্যায়ে গঠিত মনিটরিং টিম (পরিচালক/ব্যবস্থাপক, মেডিকেল অফিসার ও প্রশাসনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম) কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা মাসিক মনিটরিং করবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসমূহের একটি টিম নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা বৎসরে দুবার মনিটরিং করবে। এছাড়া প্রতিমাসের প্রতিবেদন দেখে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম প্রতিমাসেই অধিদপ্তর থেকে মনিটরিং করা হবে। কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য নির্ধারিত মনিটরিং ফরম্যাট ব্যবহার করতে হবে।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী ও সুপারভাইজারদের নির্ধারিত চেকলিষ্ট পুরণ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি বিষয় নিজেরা যাচাই করে লিখতে হবে ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

অধিবেশন

২০

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিতকরণ

অধিবেশন ২০

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিতকরণ

উদ্দেশ্যসমূহ : এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ, একজন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী হিসেবে কিভাবে তার এলাকার গেটকিপারদের কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিত করবেন তা অনুশীলন করবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য	৫ মিনিট	বক্তৃতা	–
২	কিভাবে একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ে তার এলাকার গেটকিপারদের অবহিত করবেন	৪০ মিনিট	অনুশীলন ও গঠনমূলক ফিডব্যাক, আলোচনা, প্রদর্শন	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লাশকার্ড, গেটকিপারদের জন্য কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যকনিকা

সহায়ক তথ্য ২০

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিতকরণ

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে তাদের এলাকার গেটকিপারদের অবহিত করা। গেটকিপারগণ বিষয়গুলো জেনে সচেতন হবেন, কিশোর-কিশোরীদের কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করাসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারবেন ও সর্বোপরি, কৈশোরবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।

স্লাইড ২০.১ :

গেটকিপার কারা

গেটকিপার বলতে বোঝায় মা-বাবা, অভিভাবক ও সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ যাদের মতামত কিশোর-কিশোরীদের জীবন তৈরি ও যাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীগণ উঠান বৈঠক, বাড়ি পরিদর্শন, স্যাটেলাইট/ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও কমিউনিটি সভার মাধ্যমে গেটকিপারদের অবহিত করতে পারেন।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ নিচের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ের গেটকিপারদের অবহিত করতে পারেন:

উঠান বৈঠক এবং স্যাটেলাইট/ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যশিক্ষা

বিষয়	প্রক্রিয়া
কৈশোর, বয়ঃসন্ধিকাল এবং শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ	কৈশোর/বয়ঃসন্ধিকালের সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করবেন। তারপর গেটকিপারদের জিজ্ঞাসা করবেন যে, কৈশোর বয়সে তাদের কি কি শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। আলোচনার সময় ফ্লাশ কার্ডের 'কৈশোরে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন' সকলকে দেখাবেন ও বিষয়বস্তুর ফিডব্যাক নিয়ে উঠান বৈঠক শেষ করবেন।
বাল্যবিবাহ	বাল্যবিবাহের নিয়ে ঘটনা দিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারেন যেখানে গেটকিপারগণএলাকার অবস্থা তুলে ধরবেন। আরো আকর্ষণীয় করতে কিশোর-কিশোরীদের দিয়ে বাল্যবিবাহের রোল প্লে করাতে পারেন যেখানে সমস্যা নিয়ে গেটকিপারগণ আলোচনা করতে পারেন। কোনো ভিডিও দেখানোর সুযোগ থাকলে তা ব্যবহার করা যায়।
পরিবার পরিকল্পনা	বাল্যবিবাহের ঘটনা বা আলোচনার রেশ ধরে কিশোরীদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন সম্পর্কে বলবেন। এরপর গেট কিপারদের ফ্লাশ কার্ড বা ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শন করে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে এলাকার স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র থেকে যে কিশোর-কিশোরীরাও পদ্ধতিসমূহ নিতে পারে (বড়দের পাশাপাশি), সেটার ওপর জোর দিতে হবে।

বিষয়	প্রক্রিয়া
কিশোরীদের নিরাপদ মাতৃত্ব	বাল্যবিবাহের ফলে কিশোরীরা অল্প বয়সে গর্ভধারণ করে এবং এজন্য তারা যেসব গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর ঝুঁকির সম্মুখীন হয়– গেটকিপারদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এই আলোচনাটি করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের করণীয় আলোচনার সময় ফ্লিপ চার্ট বা ছবি ব্যবহার করে গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর চেকআপ দেখানো যেতে পারে। আলোচনার সময় পরিবার কিভাবে কিশোরীদের সহায়তা দিতে পারে, তার উপর জোর দিতে হবে।
মাদকাসক্তি	এই বিষয়টি নিয়ে ফ্লাশ কার্ডে ও তথ্যকনিকায় দেয়া তথ্য সমূহ আলোচনা করে গেটকিপারদের কাছে তাদের করণীয় জানতে চাইতে হবে। আলোচনার সময় কিভাবে গেটকিপারগণ মাদকাসক্ত কিশোরদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে আসক্তি থেকে ফিরিয়ে আনতে বা সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারেন, সেটি প্রাধান্য পাবে।
কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা	কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে কথা বলার সময় এখানে কি কি সেবা পাওয়া যায় ও যে লোগো দেখে এই সেবাকেন্দ্র চেনা যায় সেগুলো আলোচনা করতে হবে। ফ্লাশ কার্ড দেখিয়ে সকলকে সেবাসমূহ ও লোগো জানাতে এবং চেনাতে হবে।

বাড়ি পরিদর্শন ও কমিউনিটি পর্যায়ে সভায় তথ্য প্রদান

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ, বাড়ি পরিদর্শন ও কমিউনিটি পর্যায়ে সভায় অংশগ্রহণের সময় কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ে কথা বলার জন্য উঠান বৈঠকের মতো যথেষ্ট সময় পাবেন না। সেক্ষেত্রে তারা ফ্লাশ কার্ড, ফ্লিপ চার্ট ও তথ্যকণিকা থেকে মূল বার্তাটি দেখাবেন, সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করবেন ও সকলের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেবেন।

স্লাইড ২০.২ঃ

গেটকিপারদের অবহিত করার সময় স্বাস্থ্যকর্মী/স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের যা খেয়াল রাখতে হবেঃ

- আলোচনা শুরুর আগে নিজে প্রস্তুতি নেবেন
- সহজ ভাষায়, হাসিমুখে ও গুছিয়ে কথা বলবেন
- গেটকিপারদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ও সে অনুযায়ি সাড়া দেবেন
- গেটকিপারগণ বুঝতে পারছে কিনা সেটা ফিডব্যাক নিয়ে যাচাই করবেন
- আলোচনার বিষয়ের সাথে মিল রেখে উপকরণ ব্যবহার করবেন (উপকরণ ব্যবহার করার জন্য আলাদা প্রশিক্ষণও রয়েছে যা তারা নিতে পারেন)
- আলোচনার সময় গেটকিপারদের সম্পৃক্ত করবেন

অধিবেশন

২১

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য অর্জন

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য অর্জন

পরিশিষ্ট ১ : প্রশিক্ষণসূচি

কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২ দিন)

দিন/সময়	প্রশিক্ষণ অধিবেশন	বিষয়বস্তু
প্রথম দিন		
৯.০০-১০.০০	অধিবেশন-১	নিবন্ধন, উদ্বোধনী, পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণনীতিমালা
১০.০০-১০.৪৫	অধিবেশন-২	কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ
১০.৪৫-১১.০০		চা বিরতি
১১.০০-১১.৪৫	অধিবেশন-৩	কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন অঙ্গ এবং প্রজনন অধিকার
১১.৪৫-১২.৩০	অধিবেশন-৪	কৈশোর, বয়ঃসন্ধিকাল এবং শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ
১২.৩০-১.১৫	অধিবেশন-৫, ৬	কিশোরীদের মাসিকের ব্যবস্থাপনা এবং কিশোরদের স্বপ্নদোষের ব্যবস্থাপনা
১.১৫-২.০০	দুপুরের খাবারের বিরতি	
২.০০-২.৪৫	অধিবেশন-৭	কৈশোরকালীন মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা
২.৪৫-৩.৩০	অধিবেশন-৮	কৈশোরকালীন সমস্যাসমূহ
৩.৩০-৪.১৫	অধিবেশন-৯	কৈশোরকালীন পুষ্টি এবং পুষ্টিজনিত সমস্যা
৪.১৫-৫.০০	অধিবেশন-১০-১১	বাল্যবিবাহ, পরিণতি ও প্রতিরোধ এবং পরিবার পরিকল্পনা
দ্বিতীয় দিন		
৯.০০-৯.৪৫	অধিবেশন-১২	কিশোরীদের নিরাপদ মাতৃত্ব
৯.৪৫-১০.৩০	অধিবেশন-১৩	কিশোরীদের অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধ ও গর্ভপাতপরবর্তী সেবা
১০.৩০-১১.১৫	অধিবেশন-১৪	কৈশোরকালীন জেন্ডার বৈষম্য, নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং প্রতিকার
১১.১৫-১১.৩০		চা বিরতি
১১.৩০-১২.১৫	অধিবেশন-১৫	কৈশোরে মানসিক স্বাস্থ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ
১২.১৫-১.০০	অধিবেশন-১৬	মাদকাসক্তি, প্রতিরোধ ও প্রতিকার
১.০০-১.৪৫	দুপুরের খাবারের বিরতি	
১.৪৫-২.৩০	অধিবেশন-১৭	কৈশোরে যৌনবাহিত ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস
২.৩০-৩.১৫	অধিবেশন-১৮	কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং ও রেফারাল
৩.১৫-৪.০০	অধিবেশন-১৯	তথ্য সংরক্ষণ, সুপারভিশন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং
৪.০০-৪.৪৫	অধিবেশন-২০	কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিতকরণ
৪.৪৫-৫.০০	অধিবেশন-২১	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ও এর সাথে সম্পর্কিত কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য অর্জন
৫.০০-৫.১৫	**সমাপনী**	

পরিশিষ্ট ২
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নিচে দেয়া হলো যেগুলো প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণের সময় জেনে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

১. বক্তৃতা (Lecture)

বক্তৃতা সবচেয়ে পুরনো প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীরা তা শুনে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেন। বক্তৃতা একমুখী হয় যখন শ্রোতারা নিশ্চুপ থাকে ও বক্তা কথা বলেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব যোগ করে, প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বক্তৃতাকে দ্বিমুখী করা যায়।

বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার হয়ঃ

- যখন সুসংগঠিতভাবে তথ্য উপস্থাপন প্রয়োজন
- যখন কোনো বিষয় বা সমস্যা চিহ্নিত করা অথবা সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া প্রয়োজন
- যখন বিতর্কিত বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন
- যখন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন
- যখন বক্তার অভিজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন
- যখন সময় ও স্থান স্বল্পতা হেতু অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার অসম্ভব

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– প্রশিক্ষণের মান ঠিক রেখে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি সম্ভব – লিখতে পড়তে সক্ষম এমন প্রশিক্ষণার্থীর বেলায়ও প্রয়োগযোগ্য – অল্প সময়ে অধিক তথ্য দেয়া সম্ভব – বিষয়কে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা যায় – স্বল্প সময়ের মধ্যে সংগঠিত করা যায় – নতুন বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলা যায় – অন্য পদ্ধতির সাথে ব্যবহার করা যায়	– এর সাফল্য একজন মাত্র ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল – এর সার্থকতা পরিমাপ অত্যন্ত কঠিন – এটি একঘেয়ে পদ্ধতি – কারো কোনো সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ সীমিত – বিষয় সম্পর্কে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়

২. দলীয় আলোচনা (Group discussion)

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী যখন কোনো সাধারণ বিষয়ে আলাপ করে তখন তাকে দলীয় আলোচনা বলে। এখানে সাধারণ বিষয় বলতে সবার উৎসাহ আছে এমন বিষয়কে বোঝানো হয়। তবে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৬ এর কম এবং ২০ এর বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশিক্ষক আলোচনাকে ফলপ্রসূ করার জন্য নিজেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

দলীয় আলোচনা ব্যবহার হয়:

- যেখানে সকল প্রশিক্ষণার্থীর কাছে বিষয়টি স্পষ্ট নয়
- যেখানে প্রশিক্ষণার্থীদের নেতৃত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়
- যেখানে চিন্তা শক্তি জাগ্রত করা প্রয়োজন আছে
- যেখানে কোনো সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টা আছে
- যখন স্বল্প সংখ্যক ভিন্নমত পোষণকারীর দৃষ্টিভঙ্গী বদলের প্রয়োজন হয়

দলীয় আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করা যায় – প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার নিজের অবস্থান বুঝতে পারে – আলোচনা একঘেয়েমি মুক্ত হয় – পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়	– বিষয় সম্পর্কে ভালো জ্ঞান না থাকলে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না – আলোচনা স্বল্পসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সীমিত হয়ে যেতে পারে – কোনো কোনো প্রশিক্ষণার্থী অন্যদের দমিয়ে রাখতে পারেন – সময় বেশি নেয় – লক্ষ্যহীন আলোচনায় অযথা সময় ব্যয় হতে পারে

দলীয় আলোচনার সাফল্য নির্ভর করে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও বুদ্ধির ওপর। তবে আলোচনার জন্য অবশ্যই পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। বিষয় যত জটিল হবে সময়ও তত বেশি প্রয়োজন হবে। সাধারণতঃ সকালের দিকে অর্থাৎ কোনো কাজ হাতে নেয়ার আগেই আলোচনায় বসা উচিত।

৩. ভূমিকাভিনয় বা রোল প্লে (Role play)

ভূমিকাভিনয় একটি কার্যকরী প্রশিক্ষণ কৌশল। এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীরা বাস্তব কতগুলো ভূমিকা/চরিত্রে অভিনয় করে। উদাহরণস্বরূপ প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে কেউ কৃষকের অভিনয়, কেউ গ্রাম্য মোড়লের অভিনয় এবং কেউ উন্নয়নকর্মীর অভিনয় করতে পারে। অভিনয়কালে তারা বাস্তব সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলাপ করে।

ভূমিকাভিনয় ব্যবহার হয়:

- যেখানে প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষার মান নিচু
- যেখানে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক যাচাই করা হয়
- যেখানে কোনো সমস্যার জন্য সমাধান বের করার চেষ্টা করা হয়

ভূমিকাভিনয় দু'ধরনের হতে পারে– প্রথম ক্ষেত্রে, প্রশিক্ষক নির্দিষ্ট করে দেন কি করতে হবে অর্থাৎ একটি গাইডলাইন থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, শুধু সমস্যা দিয়ে দেয়া হয়, চরিত্রে রূপদানকারীরাই সেখানে তাদের বক্তব্য ঠিক করে।

ভূমিকাভিনয়ের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– অভিনয়কারীরা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারে – অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী কোনো না কোনো চরিত্রের সাথে একাত্নতা বোধ করার মাধ্যমে অধিকতর অংশগ্রহণ করতে পারে। – সহজেই সমস্যাগুলো অনুধাবন করানো যায়। – অনেক বিষয় আছে যা আলোচনা বা বক্তৃতায় প্রকাশ করা যায় না, ঐসব ব্যাপার অভিনয়ের মাধ্যমে দিব্যি বলা যায়। – প্রশিক্ষণে একঘেয়েমি দূর করে প্রাণবন্ত করা যায়। – পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংবেদনশীলতা বাড়ায়	– খুব জটিল সমস্যার সমাধান এ পদ্ধতিতে সম্ভব নয় – সময়সাপেক্ষ ব্যাপার – উপস্থাপন ও পরিচালনা যথাযথ না হলে নেতিবাচক ফল আসতে পারে।

৪. ঘটনা বিশ্লেষণ (Case study)

লিখিত কোনো ঘটনা পড়া ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণই ঘটনা বিশ্লেষণ। ঘটনাটি প্রকৃত কোনো ঘটনা অথবা কল্পিত হতে পারে। তবে কল্পিত হলেও বাস্তবের সাথে ঘটনার মিল থাকতে হবে।

প্রয়োগ ক্ষেত্র:

- সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা জাগানোর জন্য
- সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়া বোঝাবার জন্য
- অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নেয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য

ঘটনা বিশ্লেষণের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– ঘটনাকে যতটা সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করার সুযোগ আছে – একই সমস্যার বিভিন্ন সমাধান পাওয়া যায় – প্রশিক্ষণার্থীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় – প্রশিক্ষার্থীগণ আলোচনার প্রতি মনোযোগী হয় – নিজেদের ভুল ধারণাসমূহ শুধরে নেবার সুযোগ পায়	– দীর্ঘ সময় ব্যয় হয় – কোনো কোনো প্রশিক্ষণার্থী ঘটনা সাজানো মনে করে উৎসাহ হারাতে পারে – পরস্পরবিরোধী উত্তর মনে সংশয় সৃষ্টি করতে পারে

ঘটনা বিশ্লেষণের সাফল্য মূলত নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপর। প্রথমত ঘটনাটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও প্রযুক্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবেশিত হতে হবে। দ্বিতীয়ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করতে হবে। ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের ভূমিকা যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। তবে আলোচনাকে বিশ্লেষণমুখী করার জন্য মাঝে মাঝে তাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য কতখানি সময় দিতে হবে তা ঘটনার গুরুত্ব ও জটিলতা দ্বারা নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রশিক্ষণার্থীর বিশ্লেষণ ক্ষমতাও বিবেচ্য।

৫. পর্যায়ক্রমে পাঠ (Study circle)

এ পদ্ধতিতে কোনো বিষয়কে লিখিত আকারে প্রশিক্ষণার্থীর সামনে উপস্থিত করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে লিখিত বিষয়ের অংশবিশেষ পাঠ করতে বলা হয়। একজনের পাঠ শেষ হলে তাকে তার পঠিত অংশটুকু ব্যাখ্যা করতে বলা হয়। তার ব্যাখ্যা শেষ হলে অন্যান্য এর মতামত আহ্বান করা হয়। এইভাবে একজনের পর একজন পাঠ করে এবং তারপর সবাই মিলে আলোচনা করে।

প্রয়োগ ক্ষেত্র:

- যেখানে উদ্দেশ্য থাকে সবাইকে অংশগ্রহণ করানোর
- যেখানে লক্ষ্য প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান বৃদ্ধির
- যেখানে প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান স্বল্প অথবা অসচ্ছ

পর্যায়ক্রমে পাঠের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় – আলোচনা উদ্দেশ্যহীন হয় না – একইসাথে পঠন ও আলোচনা বেশি সুফল আনে – অন্য কোনো সরঞ্জাম ছাড়া প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যায়	– পঠন ও আলোচনা বাধ্যতামূলক হওয়ার ফলে কেউ কেউ নিরুৎসাহিত হতে পারে – পঠন ও আলোচনা ভাগ ভাগ করে হওয়ার ফলে বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক মতামত পাওয়া মুশকিল হয় – কোনো কোনো কৌশল যেমন– বক্তৃতা ইত্যাদির চেয়ে সময় বেশি লাগে

৬. মুক্তচিন্তার ঝড় (Brain storming)

মুক্তচিন্তার ঝড় এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সবাইকে চিন্তার স্বাধীনতা দেয়া হয়। সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানসমূহ কিংবা উত্থাপিত বিষয়সমূহ কতখানি বাস্তবসম্মত সে ভাবনা না করে কেবল নতুন নতুন চিন্তাধারা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। যে যা ভাবে, সে তাই ব্যক্ত করে। অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে সবাই মুক্ত। সব দলের সামনে এভাবে অনেক ভাবনা প্রকাশিত হয়।

প্রয়োগ ক্ষেত্র :

- প্রশিক্ষণার্থীদের চিন্তার সৃষ্টিশীলতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে
- যেখানে অন্যান্য পদ্ধতি উদ্দীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে
- সৃষ্টিশীল চিন্তাকে উৎসাহিত করতে

সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– দীর্ঘদিন যে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়নি, হঠাৎ করে – সে সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে – সকল প্রশিক্ষণার্থী সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সময় কম লাগে – বেশি ধারণার সৃষ্টি হয় – পারস্পরিক মতো বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয় – চিন্তার স্বাধীনতা অনেককে নতুনভাবে চাঙ্গা করে তোলে	– বাস্তব অবস্থার বাইরে চিন্তাকে প্রসারিত করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব – অনেক আলোচনা বা চিন্তা একেবারে মূল্যহীন হয়ে থাকে – মূল্যায়নের সময় সকলের মতামতের ত্রুটিগুলো তুলে ধরতে হয় বলে কেউ কেউ অস্বস্তিবোধ করতে পারে – অনেক সময় কম মাত্রায় বিশ্লেষণের জন্য ধারণাগুলো অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে – সঙ্গতিহীন কিছু মতামত আসতে পারে – মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে

৭. চার্ট প্রদর্শন (demonstration)

কোনো বিষয়বস্তুকে ছবির বা লেখার সাহায্যে সহজভাবে, আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করার মাধ্যম বা উপকরণকে চার্ট বলে। এই চার্ট প্রশিক্ষণার্থী বা অংশগ্রহণকারীদের সামনে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করাকেই চার্ট প্রদর্শন বলে। এটি শিক্ষার সুন্দর পদ্ধতি যাতে একই সাথে দেখা ও শোনার কাজ হয়। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ ধারণা লাভ হয় এবং তাদের সমস্যা সমাধানে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– চার্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে আগ্রহ বাড়ে – দেখা ও শোনার কাজ একই সাথে হয় – বক্তব্যকে অধিকতর প্রাণবন্ত করা যায় – বিষয়বস্তু সহজে বোধগম্য হয় – আলোচনা খোলামেলা ও আকর্ষণীয় হয়	– চার্ট প্রদর্শন ঠিকমত উপস্থাপন করতে না পারলে ফল উল্টো হতে পারে – চার্ট অস্পষ্ট হলে উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হয় না – সব বিষয়ের ওপর চার্ট প্রদর্শন করা যায় না – অনেক সময় বিষয়বস্তু থেকে ছবির প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে পড়তে পারে – বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারীদের সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত না হলে কার্যকর হয় না

৮. বাজ গ্রুপ (Buzz group)

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ ফিলিপ বাজ এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন। তার মতে মনোযোগ সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সময় যত বাড়তে থাকে মনোযোগ তত নিম্নমুখী হয়। যত বেশি সময় ধরে ক্লাস চলতে থাকে মনোযোগও সেই হারে কমতে থাকে। বক্তব্য শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ অনেক বেশি থাকে। আর সময় যত বাড়তে থাকে মনোযোগও কমতে থাকে। এভাবে দেখা যায় বক্তব্য যখন শেষ, তখন অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগও প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে যায়। তাই এই মনোযোগ ধরে রাখার জন্য কিছুক্ষণ পরপর নতুন কোনো পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।

এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে বড় দলের প্রতিটি সদস্য সরাসরিভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। বড় দলটিকে আলোচনার জন্য ছোটো ছোটো দলে (৩-৪ জন) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (৫-৭ মিনিট) ভাগ করে দেয়া হয়। যাতে প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ ধারণা ব্যক্ত করতে পারে। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষককে সময়ের প্রতি বেশি খেয়াল রাখতে হয়।

সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে অংশগ্রহণের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় – এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা যায় – অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়	– সময় বেশি লাগে – ব্যক্তির অংশগ্রহণ সময় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত – দলের মতামত দ্বন্দ্বমূলক হতে পারে অথবা সেগুলোর সমন্বয় সাধন সুবিধাজনক নাও হতে পারে

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

Directorate General of Family Planning

Kingdom of the Netherlands

unicef